মরণোত্তর

– এসএম আছাব আলী

১৯৬১ সালে বগুড়া আযীযুল হক কলেজে পড়তাম। কলেজ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে শহরতলীর এক গ্রামে শাহাদৎ সরকার নামে এক গৃহস্থের বাড়িতে লজিং থাকতাম। তার দুই ছেলে, দুই মেয়ের মধ্যে সালমা ছিল সকলের বড় এবং তখন সে ক্লাস সিক্সে পড়তো। সচ্ছল এই পরিবারের সদালাপী, মিশুক ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের লোকজন আমাকে খুবই ভালোবাসতো। যাহোক, এদের আদর যত্নের মধ্যে বেশি দিন থাকতে পারিনি। সে বছরই ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন পাকিস্তান নৌ বাহিনীতে ভর্তি হয়ে করাচি চলে যাই।

তারপরেও অনেক দিন এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। বছরে এককালীন ষাট দিনের ছুটি পাওয়া যেতো। করাচি–ঢাকা পিআইএ–তে বিমান ভ্রমণ সত্যি খুব আনন্দের ছিল। মা, বাবা, ভাই বোন ও প্রিয়জনদের জন্য চামড়ার বাক্স ভর্তি শাড়ি, জামা–কাপড় এবং খেজুর পাতার ঝুড়ি ভর্তি ফল–মূল নিয়ে বাড়ি এলাম। আর বাড়ি এলেই সেই লজিং বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। শেষবার সেখানে গিয়েছিলাম ১৯৬৯ সালে। তখন সালমা বিএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী ছিল। কোনো প্রকার রোমান্টিকতা নয়, কোনো প্রকার আকর্ষণও নয়, নিতান্তই স্নেহাস্পদ হিসেবে করাচির বড়িবাজারে (বড়বাজার) কেনা ভালো একটা লাল শাড়ি সালমাকে দিয়েছিলাম।

তারপর আর সেখানে যাইনি বা চিঠি লেখাও হয়নি। নিজের ব্যস্ততায় দীর্ঘ জীবন কেটে যায়। চাকরি জীবন শেষ করে গ্রামের বাড়ি এসে অবসর জীবন শুরু করেছি এবং তাও অনেক দিন হলো। কবে কার বাড়িতে অন্ন খেয়ে লেখাপড়া করেছি তা ভুলেই গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম সেই শাড়িটির কথা।

আজ থেকে প্রায় বছর দুই আগে কোনো কাজে বগুড়া গিয়েছিলাম। সপ্তপদী মার্কেটে আমার পূর্ব পরিচিত এক লোকের সঙ্গে দেখা। তার কাছে জানতে পারলাম আমার সেই লজিংমাস্টার সরকারসাহেব খুবই অসুস্থ। এতোদিন তাদের কোনো খোজ নিতে পারিনি বলে নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হলো। খুবই ব্যথিত হলাম। সেখানে ফুটপাথে ফল–মূলের দোকান থেকে আড়াই কেজি আঙুর কিনে একটা রিকশায় চেপে বললাম, চলো...।

আমার লজিংমাস্টার অশীতিপর এই বৃদ্ধকে দেখে আমার খুবই মায়া হলো। বার্ধক্যজনিত জটিল সব রোগে খুবই নাজেহাল। একদিন এই বৃদ্ধ মানুষটি আমাকে আশ্রয় দিয়ে, অন্ন দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে ভালোভাবে লেখাপড়া করার উপদেশ দিতেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে লেখাপড়া হয়নি। আমি তার আশ্রয় থেকে পালিয়ে গেলাম। তিনি চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। হয়তো চিনতে পারলেন। দুই চোখ পানিতে ভরে গেল। যে চোখে দেখা যায় না সেই চোখে এতো অশ্রু কেন, আশ্চর্য! অনেকক্ষণ তার শয্যাপাশে বসে রইলাম।

খবর এলো, বড়আপা ডাকছে।

বড়আপা?

হ্যা, তার ঘরে আসুন।

একত্রিশ বছর পর সালমার সঙ্গে দেখা হলো। ঢিলেঢালা পোশাকে সজ্জিত। আমি এক পক্ককেশ বৃদ্ধ। পঞ্চাশোর্ধ সালমাকে দেখে মনে হলো, দুঃখ বেদনার শরবিদ্ধ এক দীর্ঘাঙ্গী, ক্ষীণাঙ্গী আহত এক পাখি। আমাকে সালাম ও কুশল বিনিময় করে বসতে বললো। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্মিত হয়ে গেলাম। মনে করেছিলাম সালমার সঙ্গে দেখা হবে না। সে তার স্বামীর বাড়ি থাকে।

সালমা বললো, না, আমি এখানেই থাকি।... গার্লস হাই স্কুলে মাস্টারি করি। নিজে রান্না করে খাই। আজ রাতে আপনি আমার সঙ্গেই খাবেন।

ছেলে মেয়ে কই?

একটি মাত্র ছেলে। ব্যাংকের কর্মকর্তা, রংপুর থাকে।

মনে আছে সে রাতে সালমা তার জীবনের সব কথা আমাকে বলেছিল। বলেছিল আমার দেয়া সেই শাড়িটার কথা। নিতান্তই সৌজন্যতাবশত দান করা একটা শাড়ি কিভাবে একটা দম্পতিকে চিরতরে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারে। সেই প্রসঙ্গে সালমা বলেছিল, আমার বাবা খুব খোজখবর নিয়ে বিত্তশালী ও উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমার অতীত, আমার ভাগ্যের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে প্রতারণা করেছে। সে ছিল হীনমনের নিকৃষ্ট ধরনের এক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি। আমার দুর্ভাগ্য, ছোট বোন দুলালী আমার অজান্তে সেই শাড়ি পরে তার সামনে যায়।

সে কৌশলে শাড়ির কথা জেনে ফেলে। তখন থেকেই আমার প্রতি তার সন্দেহ ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। সে মনে করতো আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে।

অপমান ও লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে গেল। মানুষকে কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত অপবাদের শিকার হতে হয়। আর তা যদি হয় স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রতি তবে তা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

বললাম, তারপর?

তারপরও কিছুদিন কাটলো। আমাদের একটি পুত্র সন্তান হলো। তবু তাকে সন্দেহমুক্ত করা গেল না। অধিকাংশ স্বামী তাদের স্ত্রীকে কখনো কখনো সন্দেহ করে। তারপরও তারা একত্রে বসবাস করে, খায়, শোয় এবং সন্তানের জন্ম দেয়।

কখনো কখনো নয়, সে ছিল চিরস্থায়ী সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি। তার হৃদয় ছিল সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত। একজন সুদর্শন উচ্চ শিক্ষিত মানুষের অন্তর এতো কুৎসিত, এতো জঘন্য হতে পারে তা আমি কখনো কল্পনা করিনি। আমার দুঃখে কাতর হয়ে আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। মুমূর্ষু পিতার বুকে শুধু আমাকে নিয়েই যন্ত্রণা। আমার জন্য আমার ভাইয়েরা সামাজিক মর্যাদায় বিপন্ন। সালমার দুই চোখ ছল ছল করে উঠলো।

নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হচ্ছিল, কেন যে অনাত্মীয় এই মেয়েটিকে একটি শাড়ি উপহার দিয়ে তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলাম।

কাতর কণ্ঠে বললাম, শুনতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তবু বাকিটুকু বলো।

বাকিটুকু খুবই সংক্ষিপ্ত। মানসিক যন্ত্রণা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আমার বিবেক যুদ্ধ ঘোষণা করে। নয় মাসের সন্তানকে বুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসি।

তোমাদের কি ডিভোর্স হয়েছে?

না। ডিভোর্স মানে আবারও বিয়ে, আবারও লাল শাড়ি, আবারও অশান্তি। এক দেহ একের অধিক মানুষকে দান করা সম্ভব নয়। আমাকে ডিভোর্স না করে আবার বিয়ে করে সন্দেহমুক্ত জীবন যাপন করার অনুরোধ তাকে করেছিলাম। সে আমার অনুরোধ রেখেছে।

তোমাদের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে?

সে ম্লান হেসে বললো, অসম্ভব। অনেক কষ্টে ছেলেকে লালন পালন করেছি। গভীর দুঃখ, বেদনা, প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে চলেছি। আমার মনে হয়, সকল মানুষের জীবনই এমন।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

কিছুক্ষণ মনে হলো আমরা দুজনেই কথা হারিয়ে ফেললাম। তারপর বললাম, এই দীর্ঘ সময়ে হয়তো সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া তোমাদের ছেলে তো তারই উত্তরাধিকারী। সন্তান কি পিতাকে ক্ষমা করতে পারে না?

হয়তো পারে, হয়তো পারে না। সময়ই বলে দেবে তাকে কি করতে হবে বা হবে না। আপনি এখন ঘুমান। কাল আবার দেখা হবে। বিছানা, বালিশ ও মশারি ঠিক করে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভাবতে লাগলাম, আমার কি ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল?

পরদিন সকাল। বাড়ি ফিরবো। সালমা আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল।

বললাম, এটা কি?

সেই শাড়িটা।

কার জন্য?

আপনার স্ত্রীর জন্য।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলাম। বললাম, সে বেচে নেই।

যে নারী আজীবন নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে সে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে কেদে ফেললো। তবু পরাজয় বরণ করলো না। বললো, তাকে আমার মরণোত্তর উপহার।

অসহায়ভাবে ঘরের বাইরে পা রাখলাম।

রাস্তায় তখন অনেক মানুষের ভিড়।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

শেষ রক্ষা

– স্বরেয়া সামাদ

ঘটনাটা মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে শুনেছিলাম এক সহযোদ্ধার কাছে। সে মেয়েটার পরিচয় দেয়নি। তবে আমার মনে হয়েছে মেয়েটি তার কোনো আপনজন।

জরী, প্রাণ উচ্ছল হাসি খুশিতে ভরা এক কিশোরী। বাবা মায়ের এক মাত্র মেয়ে। আদরের শেষ নেই। সে কারণে তার দস্যিপনারও শেষ নেই। স্কুলের ভালো ছাত্রী কিন্তু লেখাপড়ায় মন কম।

পাড়ায় ঘুরতেই তার আনন্দ বেশি। মা শাসন করতে গেলে বাবার হাসি তাকে প্রশ্রয় দিতো। এমনভাবেই কাটছিল কিশোরী জরীর স্বপ্ন মাখা দিনগুলো।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর এই গ্রামেও তার ছোয়া লাগলো। দুই গ্রাম পরে আর্মি ক্যাম্প হয়েছে এ সংবাদে গ্রামের যুবকেরা হলো গ্রামান্তর, কিশোর–কিশোরীদের উচ্ছ্বাস হলো শান্ত। গ্রামে কবরের নীবরতা। কেউ উচু স্বরে কথা বলে না। সবাই চলছে–ফিরছে কিন্তু মনে হয় কারো দেহে প্রাণ নেই। জরী ঘরে বসে হাপিয়ে ওঠে। বাড়ি থেকে বের হতে পারে না। মেয়ে বলেই স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বোঝে, মেয়ে হবার কারণে সে আরো বেশি অনিরাপদ। এরই মাঝে লোক মুখে ফিশ ফিশ করে খবর ছড়ায় কোন গ্রামের কোন মেয়েকে পাকিস্তানিরা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে। তার পরেরটুকু আর বলতে হয় না। সবাই বোঝে মেয়েদের ক্যাম্পে ধরে নেয়ার পর কি হয়। এসব কথাও জরীর কানে আসে। রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে মা কেপে ওঠেন।

পাড়া মাথায় করে ঘুরে বেড়ানো জরীর সময় কাটে বাড়ির মধ্যে। পারতপক্ষে উঠান পেরিয়ে বাইরে পা রাখে না সে। ঘরে বসে সময় কাটে না, স্কুলে যায় না, পড়াশোনাও নেই। সময় যেন পাথর হয়ে বুকে চেপে বসে। এক এক দিন ছোটবেলার পুতুলগুলো নিয়ে বসে সময় কাটাতো।

সেদিন মায়ের একটা লাল টুকটুকে শাড়ি বের করলো। তারপর বায়না ওটা সে পরবে। বারণ করতে গিয়েও বারন করা হলো না। ভাবলেন পাড়া বেড়ানো মেয়েটা সারাদিন ঘরে বসে থাকে, থাক না একটা কিছু নিয়ে। অপটু হাতে জরী প্রথমবারের মতো শাড়ি পরলো। চুড়ি পরলো, কাজল দিল, লাল ফিতে দিয়ে চুল বাধলো। তারপর আয়নার সামনে দাড়িয়ে ভেংচি কাটলো নতুন জরীকে।

হঠাৎ গ্রামে চাপা হই চই। সবাই ছুটছে। শোনা গেল গ্রামে মিলিটারি এসেছে। বাবা বাড়ি নেই, মা গেছেন পাশের কোনো বাড়িতে। বোকার মতো উঠানে দাড়িয়ে রইলো জরী। পাশের বাড়ির চাচি ছুটে যাবার সময় জরীকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, পালা।

জরী মায়ের অপেক্ষায় কিছু সময় কাটালো, তারপর যখন পা বাড়ালো, দেখা গেল নতুন পরা শাড়ি তাকে দ্রুত চলতে দিচ্ছে না। পদে পদে পা আটকে যাচ্ছে। এভাবে জরী কিছু দূর যাবার পর পাকিস্তানিদের নজরে পড়ে গেল। তারপর যা হবার তাই হলো। জরীসহ আরো কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে গেল ক্যাম্পে। জরীকে রাখা হলো পৃথক ঘরে।

জড়সড়ো হয়ে বসে চোখের জলে বুক ভাসালো জরী। সে বুঝতে পেরেছে এরপর কি হবে। এও বুঝেছে, এই নরপশুদের হাত থেকে মুক্তির উপায় নেই। তাকালো শরীরে জড়িয়ে থাকা শখ করে পরা শাড়ির দিকে। এ শাড়িই তাকে আটকিয়েছে আজ, শাড়ির জন্যই সে ছুটে পালাতে পারেনি, বার বার পা বেধে গেছে।

এখন বিকেল। ক্যাম্প শান্ত, রাতে মৌজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জরী। যে শাড়ি আজ তাকে নরপশুদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছে সেই শাড়িই তাকে নরপশুদের হাত থেকে রক্ষা করবে। এ ছাড়া কোনো পথ নেই। বাবার কথা, মায়ের কথা শেষবারের মতো মনে করলো জরী।

সন্ধ্যার পর ঘরের দরজা খুলে চমকে উঠলো তারা। ফ্যানের সঙ্গে পরনের শাড়ি দিয়ে ফাস লাগিয়ে ঝুলে রয়েছে বাচ্চা মেয়েটা। আধা আলোয় ভৌতিক দৃশ্য।

শখ করে পরা শাড়িটি তার মর্যাদা রক্ষা করেছে। কিন্তু জীবন রক্ষা করতে পারেনি।

ডিসি অফিস, কিশোরগঞ্জ থেকে

কষ্টের রঙ নীল

–মাছুম আলম

আমি তোমাকে ভালোবাসি এ কথা বলার জন্য তিন বছর অপেক্ষা করেছি। চামড়ার ঠোটের ফাক দিয়ে ডজন ডজন, শ শ বাক্য বের হলেও এই একটি মাত্র বাক্য ওর সামনে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারিনি। যখনই চেষ্টা করেছি, মনে হয়েছে কে যেন সুপার গ্লু দিয়ে ঠোট দুটো আটকে দিয়েছে। এটা কি নিছক একটি ব্যর্থতা নাকি আমার কাপুরুষতার জ্বলন্ত প্রমাণ তা আজো বুঝতে পারিনি।

ইমা যখন ক্লাস এইটে তখন ওর ছোটভাইকে পড়ানোর সূত্র ধরে ওদের বাসায় যাওয়া–আসা। প্রথম দৃষ্টিতেই ওকে আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করিনি বা করতে পারিনি। ভাবখানা এমন ছিল, মেয়েটি এখনো ছোট, সামনে মেলা সময় পড়ে আছে, একদিন না একদিন ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ইমা বিভিন্ন কারণে প্রায়ই আমার সঙ্গে কথা বলতো বা বলার চেষ্টা করতো। ওর কথাবার্তা মাঝে মধ্যে অসংলগ্ন অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতো। ভাবতাম, ওর মনেও কি আমার মতো কোনো মতলব আছে? আগামীর অপেক্ষায় কোনো কিছু জানতে চেষ্টা করতাম না। শত হোক মনীষীরা বলেছেন, *যে অপেক্ষা করতে পারে তার কাছে সব কিছু ধরা দিতে বাধ্য।* ইনশাআল্লাহ ইমাও ধরা দেবে এই আশায় কেটে গেল তিন বছর।

ইমা তখনো এসএসসি পরীক্ষা দেয়নি। এক রমজানে এক মাসের জন্য ছাত্র পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। এক মাস! ইমাকে না দেখে থাকা সম্ভব নয়। তাই শেষ রমজানের দিকে একদিন ওদের বাসায় গিয়ে হাজির। ইমার মা ভেতর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুশিতে গদ গদ হয়ে বললেন, ঈদের এক সপ্তাহ পর ইমার বিয়ে, এরই মধ্যে আকদ হয়ে গেছে। এদিন হতেই ছাত্র পড়ানো কাট করে দিলাম।

দীর্ঘ এক মাস পর শহরের কাছে একটি ব্যস্ততম সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দূরে পরিচিত লাগে এমন একজন মহিলা ও পাশে দাড়ানো একজন ভদ্রলোক দেখে এগিয়ে গেলাম। নীল শাড়িতে আচ্ছাদিত ইমা দাড়িয়ে আছে তার স্বামীর হাত ধরে। লম্বা, হ্যান্ডসাম স্বামীর পাশে ইমাকেও কেমন যেন লম্বা মনে হচ্ছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম নীল শাড়ির আড়ালে ইমার পায়ে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি উচু জুতা পরা। তাইতো! বুঝতে পারলাম এ কারণেই পাচ ফিট এক ইঞ্চি উচ্চতার ইমা হঠাৎ করে আমার চেয়েও লম্বা হয়ে গেছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে সে যখন ওর স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তখন মনে হচ্ছিল, ওর শাড়ির সবটুকু নীল রঙ আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ইমার শাড়ির নীল রঙ আমি দেখলেও আমার হৃদয় গহীনে কষ্টের নীল রঙ ইমা দেখলো না, কোনোদিন দেখবেও না।

তারও দুই মাস পরের ঘটনা, এক বিয়েতে ইমার সঙ্গে দেখা। কথা বলার সময় আচমকা সে প্রশ্ন করে বসলো, আপনি কি আমার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিলেন কখনো?

আমার ঠোট কেপে উঠলো। বললাম, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

সে বললো, আপনার একটা চিরকুট পেয়েছিলাম, সেখানে লেখা ছিল E - my choice. I love 'e'.

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো ওই চিরকুটটির কথা। ইচ্ছা করেই ওটা টেবিলে রাখা ইমার বইগুলোর মধ্যে ফেলে এসেছিলাম। ইমার কথা শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, যদি সত্যিই ভালোবাসার সম্পর্ক চাইতাম, তাহলে?

ভালো হতো। আমি ভেবে দেখতাম। ইমার মৃদু হাসিমাখা এই উত্তর আমাকে আবারও কষ্টের সাগরে ভাসিয়ে দিল।

দুর্ভাগ্য আমার, সেদিনও ইমার পরনে ছিল গাঢ় নীল পাড়ের শাড়ি। প্রসঙ্গ পাল্টে ইমাকে বললাম, তোমার শাড়ির পাড়টি অপূর্ব!

বলদী, সিলেট থেকে
masum32-a@yahoo.com

পঞ্চাশ রুপি

– মোহাম্মদ শেখ সেলিম

১৯৮৭ সালের ২২ জুন। আমি তখন সরকারি তোলারাম কলেজে আই কম সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। সেদিন বিকেল বেলা আমার বন্ধু টুটুল বললো, এখন কলেজ বন্ধ। চল, আমার গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা থেকে ঘুরে আসি। আম্মার কাছে অনুমতি চাওয়ার পর বললেন, তুমি বাবা, ঢাকার বাইরে কোনোদিন এক রাত থাকোনি। তোমাকে কিভাবে যেতে দিই। আব্বা ছিলেন প্রাণখোলা মানুষ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে অন্তত তিনি না করবেন না। তারপর আব্বা আমাকে বললেন, তুমি এখন বড় হয়েছো। সব কিছু বোঝার এবং ঘুরে দেখার সময় এখন শুরু হয়েছে। আব্বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন। আম্মাকে জোর করে রাজি করালাম।

অবশেষে ২৩ জুন নাইট কোচে রওনা দিলাম চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশে। পরদিন সকালবেলা পৌছালাম ঠিক নয়টার সময় ওদের গ্রামের বাড়ি জীবননগর। বিকেল বেলা টুটুলের স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর বেশ ভালো সময় কাটালো। ওর এক বন্ধু বললো, তোমরা ভালো সময়ে এখানে বেড়াতে এসেছো।

বললাম, কেন?

ও বললো, আগামীকাল থেকে ভারতে মেলা শুরু হচ্ছে। জীবননগর বাংলাদেশ বর্ডারের সঙ্গে। বাংলাদেশিরা মেলায় না গেলে মেলা জমে না। এবং লোক হয় না। তাই বর্ডারের বিএসএফ এবং আমাদের বিডিআর বাহিনীর মধ্যে এক অলিখিত চুক্তিতে তিন দিন সবাই অবাধে যাতায়াত এবং মাল আনা নেয়া করতে পারে। এটাকে সবাই ম্যাটিনি মেলা বলে।

এই কথা শুনে আমার আনন্দ ধরে না। সবাইকে বললাম, চল, আমরা আগামীকালই মেলায় যাবো। বর্ডার এরিয়া। বাইপাস রাস্তা। উচু–নিচু কাচা সড়ক। শুধু সাইকেল ও মহিষের গাড়ি হলো বাহন। অগত্যা আমরা পাচ বন্ধু আমি, টুটুল, খন্দকার, লিজু এবং শামীম পায়ে হেটে রওনা দিলাম। পথ যেন আর ফুরায় না। সাড়ে তিন মাইল হাটার পর বর্ডারের কাছে এলাম। তখন দেখতে পেলাম আমাদের বিডিআর ভাইয়েরা বেশ দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলাম। আমরা নিশ্চিন্তে বাংলাদেশ সীমানা পার হলাম। ওপারে

অর্ধকিলোমিটার যাওয়ার পরে বিএসএফ–এর দেখা পেলাম। গাছের আড়ালে দুই বিএসএফ বসে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। ওদের দেখেই আমাদের মনে একটু ভয় ধরে গেল। তারপর আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা না করাতে কিছু দূর হেটে মেলায় পৌছালাম।

এখানে একটি কথা না লিখে পারছি না তা হলো, আমাদের বিডিআর ভাইয়েরা যে রকম হ্যান্ডসাম এবং পোশাক আশাকে বেশ পরিপাটি। তেমন বিএসএফ ঠিক তার বিপরীত। একেবারে হতশ্রী চেহারা এবং পোশাক–আশাকে ময়লা ও নোংরা। আমি এক বিএসএফ–কে দেখেছি ফুলপ্যান্ট পরেছে পাছায় তালি দেয়া।

সব বন্ধুরা মেলার এক কর্নারে কিছু দালাল শ্রেণী লোকের কাছে মানি এক্সচেঞ্জ করলাম। তখন আমরা বাংলাদেশি একশ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় পচাত্তর রুপি পেয়েছিলাম।

আমার ছোট ভাইবোনদের জন্য টুকটাক এটা–সেটা কেনার পর হঠাৎ আমার এক দোকানে নজর গেল। দেখলাম পাশাপাশি কয়েকটি শাড়ির দোকান। তার মধ্যে আমার একটি শাড়ি খুবই পছন্দ হলো আর তখনি আমার মায়ের ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বন্ধুদের বললাম তোমাদের মধ্যে কার আগের অভিজ্ঞতা আছে শাড়ি কেনার। সবাই দেখি আমার মতো আনকোরা। যাই হোক। আমরা সবাই একযোগে শাড়ির দোকানে প্রবেশ করলাম। দোকানির সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর দোকানে বসা এক ভদ্রলোক আমাদের উদ্দেশে বললো, দাদারা কি সবাই ওই পার থেকে এসেছেন? সবাই সমস্বরে হ্যা বললাম। দোকানদারকে বললাম, দাদা, আমাকে ওই শাড়িটি দেন।

দোকানি আমার পছন্দের শাড়ি এবং আরো দুই কালারের শাড়িসহ মোট তিনটি শাড়ি দিল। কথার ফাকে ওদের বেয়ারা টাইপের এক ছেলেকে বললো, দাদাদের জন্য চা নিয়ে আয়। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ *যাই* বলে উঠে গেল চা আনতে।

দোকানদার এর মধ্যে আমাদের বেশ অনেকগুলো শাড়ি দেখালো। কিন্তু সব বন্ধুরা আমার প্রথম দেখা শাড়িটিই পছন্দ করলো। জিজ্ঞাসা করলাম, শাড়ির দাম কতো?

দোকানদার বললো, আর কি বলবো দাদা আপনারা কষ্ট করে আমাদের মেলায় এসেছেন দাম কি বেশি নেবো। দেন ছয়শ রুপি।

আমি তখন কলেজের ছাত্র, ছয়শ রুপি আমার কাছে অনেক টাকা। অনেকক্ষণ দরকষাকষির পরে চারশ পঞ্চাশ রুপি দিয়ে শাড়িটি কিনলাম। আমার জীবনের প্রথম শাড়ি কিনে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করলাম। এখানে একটি কথা বলে রাখছি, আমরা প্রায় শাড়ির দোকানে পৌনে এক ঘণ্টা থাকাকালে আমাদের জন্য চা আসেনি।

এবার বাসার দিকে ফিরছি। ভারতীয় বর্ডারের প্রায় শেষ প্রান্তে। বাংলাদেশ সীমান্ত আর মাত্র বিশ কিংবা বাইশ মিটার দূরে হবে। হঠাৎ শুনি পায়ের আওয়াজ। পেছনে ফিরে দেখি এক বিএসএফ আমাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে ডাকছে। আমরা সবাই এক সঙ্গে দাড়ালাম। কিন্তু আমাদের পাশে যারা অন্য কয়েকটি লোক ছিল তারা ভয়ে বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে দৌড় দিল। তখন উক্ত বিএসএফটি আমাদের কাছে এসে বললো, আমার বস তোমাদের ডাকছে।

বললাম কেন?

প্রতিউত্তরে সে বললো, গেলেই বুঝবে।

বিএসএফটি আমাদের সবাইকে একটা গাছের তলায় নিয়ে গেল। দেখতে পেলাম এক ইয়া মোটা গোফওয়ালা পাতার বিড়ি টানতে টানতে আমাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে আধো বাংলা, আধো হিন্দিতে বললো, *তোমকো আদমি কো সাথ কহি অবৈধ জিনিস হ্যায়। ম্যায় তোমকো সব আদমি কো ব্যাগ চেক করেঙ্গা।*

এক এক করে সবার ব্যাগ চেক করার পর অবশেষে আমার ব্যাগে ছোট বোনের কসমেটিক্স, ছোট ভাইয়ের জন্য খেলনা এবং অন্য জিনিসপত্র দেখে কিছু বললো না। হঠাৎ করে গোফওয়ালা বিএসএফটি বলে বসলো, *হামকো দেশ মে শাড়ি তোমকো মুল্লুকে অবৈধ হ্যায় মালুম।* অতএব শাড়ি রেখে যেতে হবে। এ শাড়ি কিছুতেই দেয়া যাবে না।

এই কথা শুনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার মনের অবস্থা দেখে সব বন্ধুরা বিএসএফটিকে সব রকমের ভাষা বাংলা, হিন্দি মিশ্রণ দিয়ে অনুনয়–বিননয় করে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালো। তবুও সে নাছোড়বান্দা। ওর একটিই কথা, *সব লিয়ে নিয়ে যাও শাড়ি লেয়া যাবে না।* তখন বললাম, *দা'দা, তুম সব কুছ রাখদো, মাগার শাড়ি যে নেহি দেহেঙ্গা।* হঠাৎ করে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। ওকে বললাম, *তুম রুপি চাইয়ে, ম্যায় তুম কো রুপি দেয়েগা তুম মেরেকো শাড়ি দেহেগা।* এ কথায় দেখলাম ওর চোখে মুখে এক খুশির ঝিলিক দেখা দিয়েছে। বুঝলাম কাজ হবে।

সঙ্গে থাকা ওর চামচাটি বললো, *কিতনা রুপি তুম দেহেগা ?*

বললাম, *বিশ রুপি।*

ওর বস বললো, *না, ম্যায় পঞ্চাশ রুপি চাহিয়ে।*

সব বন্ধুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আমাদের কথোপকোথন শুনছে। পকেট থেকে বাংলাদেশি একটা পাচ টাকার নোট বের করে বসওয়ালা বিএসএফটির হাতে দিলাম। ও নোটটি এপিঠ ওপিঠ দেখে আমাকে বললো, *এ কিতনা রুপি।*

বেশ দৃঢ়স্বরে বললাম, এ ওয়ালা পঞ্চাশ রুপি। ও এক হাতে পকেটে টাকা পুরতে পুরতে অন্য হাতে শাড়িটি দিয়ে বললো, *লিয়ে যাও বাচ্চালোক তুমকো পেয়ারা শাড়ি।*

অন্য বন্ধুরা এ ঘটনায় বিস্ময়ে হতবাক! দ্রুত হেটে আমরা বর্ডার পার হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে আগের কথা মনে করতেই সবার হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার অবস্থা।

বাড়িতে এসে মাকে শাড়িটি প্রেজেন্ট করার পর দেখলাম খুশিতে মায়ের চোখে জলে ভরে গেছে। রাতে বাসায় যখন ডাইনিং টেবিলে শাড়ি এবং বিএসএফ–এর ঘটনাটি বললাম তখন সবাই সে কি হাসাহাসি। তখন ছোট ভাইটি আব্বাকে বললো, আব্বু, বিএসএফ এতো বোকা! পাচ এবং পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ইংরেজি লেখাটা ধরতে পারেনি।

বাংলাদেশে থাকতে যখনি আলমারিতে শাড়িটির প্রতি চোখ যেতো তখনিই মনে পড়তো এবং হাসি আসতো সেই বোকা বিএসএফ–এর কথা আর কান্না পেতো আমার সেই বন্ধু টুটুলের কথা মনে করে যে নাকি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এখন পরলোকে।

সিকো মার্কেট, দাম্মাম থেকে

জন্মদিন

– কমল কুজুর

অনেক দিন পার হয়ে গেল। বহু চেষ্টা করেও অদিতি–কে মনের কথাটা বলতে পারিনি। পরিচয় হবার সময় আমার যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা এখনো রয়েছে। সে এতো সুন্দর, নিষ্পাপ, সরল যে, সে সামনে এলেই আমার সব কিছু ওলোট–পালোট হয়ে যায়। হাত–পা কাপে, বুক ধড়ফড় করে। কথা আটকে যায়। আসলে তাকে এতো ভালোবাসি যে, বলে শেষ করতে পারবো না।

অদিতিদের বাসার সবার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক খুব ভালো। মাঝে মধ্যেই তাদের বাড়িতে যাবার সুযোগ ঘটে আমার।

সামনে ১২ মে অদিতির জন্মদিন। মাথায় রোখ চাপে যেমন করে হোক, এবার কথাটা বলতে হবেই। বন্ধু জাহিদের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে করলাম, কিভাবে কথাটা অদিতিকে বলা যায় আর কি উপহার দেয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে।

জাহিদ বললো, জন্মদিনে সবার মন উদার থাকে নিষ্পাপ থাকে। তাই এদিনেই তোমাকে সব কথা বলতে হবে।

রাজি হলাম। এরপর সমস্যা বাধলো কি উপহার দেবো। অনেক চিন্তা, ভাবনা, আলোচনা করেও উপহার ঠিক করতে পারলাম না। শেষে সিদ্ধান্ত হলো লটারি করে যা উঠবে সেটাই উপহার দেয়া হবে। সব আইটেমগুলো চিরকুটে লিখে লটারি করলাম। জাহিদ চোখ বন্ধ করে একটা আইটেম তুললো। আইটেমটি হলো শাড়ি। আমরা দুজনেই একটু দ্বন্দ্বে পড়লাম। অদিতি এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। তাকে শাড়ি দেয়া ঠিক হবে কি? যাই হোক। লটারিতে যখন উঠেছে এটাই ঠিক।

বন্ধু জাহিদ ও আকরামের কাছে টাকা ধার করে শাড়ি কিনলাম। তারপর ১২ মে গিফট নিয়ে আমি আর জাহিদ দুজনে রওনা হলাম। অদিতিদের বাড়ি একটা মোড়ের কাছেই। আমরা মোড়ে পৌছেই দেখলাম শহরের নমীপাগলি পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। গালি দিতে দিতে। নমীপাগলির বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। তার শরীরের নিম্নাংশে শুধু একটা চটের বস্তা জড়ানো, ঊর্ধাংশ খোলা। নমীপাগলি উন্মাদ হলেও মহিলা। তাই রাস্তার পুরুষরা মজা করেই দৃশ্যটা দেখছে। নমীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েকটা দুষ্টু ছেলেমেয়ে নমীপাগলিকে ঢিল ছুড়ে মারছে। এবং দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ ভাষায় এদের গালাগালি করছে নমীপাগলি। অন্যদিন নমীপাগলির শরীরে কাপড় ঠিকই থাকে। আজ যে কি হলো? আমরা দুজনেই লজ্জায় অবনত হলাম। অবশ্য আমরা এমনিতেই লাজুক। জাহিদের দিকে তাকালাম। এবং সে আমার দিকে। এই রিকশা থাম বলে দুজনে এক সঙ্গে রিকশা থেকে নেমে পড়লাম। গিফটের প্যাকেট ছিড়ে শাড়ি বের করলাম। পাগলিকে শাড়িটা পরিয়ে দিল জাহিদ।

নমীপাগলি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার দুচোখে জলের সাগর লক্ষ্য করলাম। একটু পরেই নমীপাগলি হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগলো।

আমরা রিকশায় উঠলাম।

আমাদের লক্ষ্য করে পাগলি বলতে লাগলো তোরা পাগলা। তোরা পাগলা। তারপর সে দৌড়ে পালালো।

আমাদের আশপাশে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল। চিরায়ত বাঙালি স্বভাব। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। খালি হাতে অদিতির জন্মদিনে যাওয়া সম্ভব হলো না। মনের কথাটা এবারও বলতে পারলাম না। অদিতি, হয়তো অন্য কোনোদিন বা অন্য কোনো সময়ে তোমাকে ভালোবাসার কথা বলবোই।

দিনাজপুর থেকে

সবুজ পাড়

– বাণী আহমেদ

প্রথম ভালোবাসার উপহার

আমার বরের সঙ্গে যখন সবে প্রেম করছি তখন প্রথম ঈদে আমাকে একটা শাড়ি গিফট দেবে বলে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে অনেক দোকান ঘুরে একটি টাঙ্গাইল তাতের শাড়ি কিনেছিল খুবই সাধারণ। কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর সেই শাড়টি। জমিন তরমুজ লাল এবং পাড় সবুজ। তার দেয়া শাড়িটি সঙ্গে সঙ্গেই আমি পরতে পারিনি। আমাদের বাসার মানুষের চোখ রাঙানির ভয়ে। এই ঘটনাটি আমার জন্য খুবই কষ্টের হয়ে থাকবে চিরদিন।

প্রথম স্বীকৃতি শাড়ি

আমাদের দুজনের সম্পর্কের কথা দুই পরিবারে জানাজানি হয়ে গেল এবং আমরা দুই পরিবার থেকে স্বীকৃতি পেলাম। আমাদের দুজনের সম্পর্ক মেনে নেয়ায় রোজার ঈদে আমার হবুশ্বশুর ও শাশুড়ি আমাকে একটি শাড়ি উপহার দেন। শাড়িটি ছিল বালুচরি সিল্ক। সোনালি হলুদ জমিনে সবুজ পাড় শাড়িটি আমার জীবনে দিয়েছিল ঝলমলে আনন্দের একটি সুন্দর ঈদ। শাড়িটি পরে ঈদের মিষ্টি সকালে আম্মাকে সালাম করার পর শ্বশুর এবং শাশুড়িকে সালাম করে এসেছিলাম। এবং সেই সুবাদে তাদের দুজনের কাছ থেকে আরো উপরি পাওনা পেয়েছিলাম পাচশ টাকা করে এক হাজার টাকার ঈদের বকশিস। সত্যিকার অর্থেই ঈদটি ছিল আমার জন্য খুব সুন্দর।

কাবিনের শাড়ি

সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কাবিনের দিনটি এলো। কাবিনে আমাকে যে শাড়িটি দেয়া হলো তার রঙ ছিল ম্যাজেন্টা এবং সবুজ পাড়। মনের মধ্যে একটু খটকা লাগলো। সবগুলো শাড়ির পাড় সবুজ! কিন্তু শাড়ির সঙ্গে হীরার আংটি এবং অনেক গয়না ও আমার বরকে একদম পাকাপোক্তভাবে পেয়ে ব্যাপারটিকে তেমন পাত্তা দিলাম না। এরপরও কেন জানি *সবুজ পাড়* ব্যাপারটি মাথার মধ্যে ঘুণ পোকার মতো রয়েই গেল।

হলুদ ও বিয়ে

বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পর পরই বরকে বলেছিলাম, বিয়ের শাড়িটি যেন টকটকে লাল ও সোনালি পাড় হয়। অবশ্যই যেন *সবুজ পাড়* না হয়।

অবশেষে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। প্রথমেই গায়ে হলুদ। যেহেতু আমরা কনেপক্ষ সেহেতু তারা বরপক্ষ হয়ে এলো প্রথমে আমাদের বাড়ি। সঙ্গে সবার হাতে একটি করে ডালা এবং ডালাগুলোতে রঙিন কাগজের মোড়কে প্যাচানো, থরে থরে সাজানো জিনিস। তখনই সব জিনিস দেখা সম্ভব হয়নি। তবে যখন হলুদের শাড়ি বের করলো আমাকে পরাবে বলে তখন চমকে উঠলাম। কমলা কাতানে সোনালি বুটিক এবং সবুজ পাড়। কিন্তু এতো মানুষের ভিড়ে মন খারাপ করার সুযোগ পাইনি।

বান্ধবীরা আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে হলুদের পিড়িতে বসালো। কিন্তু হলুদের আনন্দ বা হলুদের যে অনুভূতি তার সবটা যেন ম্লান হয়ে গেল এই সবুজ পাড় ঘুণ পোকাটির জন্য। অথচ শাড়িটি ছিল খুবই সুন্দর। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা যে যার মতো চলে গেল। সবাই ফ্রেশ হয়ে বসলাম বাকি জিনিসগুলো দেখার জন্য। শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ, এটা-সেটা, আরো কতো কিছু। প্রতিটি জিনিসই সুন্দর। তবে আমার কাঙ্ক্ষিত শাড়িটি বের করতে এতো দেরি হচ্ছে কেন? লজ্জা ভেঙে বলেই ফেললাম বিয়ের শাড়ি দেখবো।

নিঃসন্দেহে সুন্দর শাড়ি। টকটকে লাল জমিনে মিনা করা কাজ এবং এর সঙ্গে খুবই কারুকার্য খচিত গাঢ় সবুজ পাড়। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কাদতে কাদতে ছোট বাচ্চাদের মতো পণ করে বসলাম বিয়েতে এই শাড়ি পরবো না। আম্মাকে বললাম নতুন শাড়ি কিনে দিতে। সবাই বোঝালো। সঙ্গে যে লেহেঙ্গা দিয়েছে বিয়েতে সেটা পরারও বুদ্ধি কেউ কেউ দিল। কিন্তু সেই লেহেঙ্গাতেও সবুজ কাজ করা।

অনেক বোঝানোর পরও যখন কোনো কাজ হলো না তখন আমার বরকে ফোন করা হলো। সে আমাকে অনুরোধ করে বললো, শাড়িটা যেন বিয়ের দিন অন্তত পরি। কারণ শাড়িটা আমার শ্বশুর নিজে পছন্দ করে কিনেছে। আমি আমার শ্বশুরকে খুব পছন্দ করি। এই ভালো মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই বিয়েতে শাড়িটা পরেছিলাম। এবং আর কখনো কেন জানি শাড়িটা আমার পরা হয়নি।

বিয়ের প্রথম ঈদ

বিয়ের প্রথম ঈদ। চারদিক থেকে ভালোবাসার ঈদ উপহার আমাকে ভরিয়ে দিচ্ছিল। আমার বরের মাথায় *সবুজ পাড়* ব্যাপারটি ভালোভাবেই গেথে গিয়েছিল। বিয়ের প্রথম ঈদে এ কারণে সে আমার জন্য শাড়ি কিনেছিল ছয় দিন ঘুরে ঘুরে, যার পাড়টি ছিল সোনালি কারুকার্য খচিত টকটকে লাল।

কলাবাগান, ঢাকা থেকে

বেহিসেবি

– শাহরিন হোসেন

নীলা চট্টগ্রাম এসেছে ওর স্বামী সিরাজের সঙ্গে। নীলার বিয়ে হয়েছে মাত্র পাচ মাস আগে। প্রেমের বিয়ে। বিয়েতে দুই পক্ষের কোনো পক্ষই রাজি ছিলেন না। শুধু পাত্রপাত্রীর একগুয়েমিতেই বিয়েটা

ঘটেছে। সিরাজ যশোর জেলার অন্তর্গত নোয়াপাড়া উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার। আর্থিক অবস্থা তো ভালোই না তার উপর ওই গ্রামের মতো জায়গায় কারই বা মন টেকে?

সিরাজের ট্রেনিংয়ের চিঠিটা আসতেই টনক নড়লো। নীলাকে কোথায় রেখে যাবে? তাই সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াই ভালো। এসেই পড়েছে এক অস্বস্তিকর পরিবেশে। নবিশ ডাক্তারদের জন্য মেডিকাল কলেজে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্ত্রী নিয়ে থাকার ব্যবস্থা নেই।

হোটেলে থাকতে গেলে পনেরো দিনে যে বিরাট অংকের টাকা খরচ হবে তাতে বেড়ানোর সাধ এক মিনিটে হাওয়া।

প্রথম দিন হোটেলে থেকেই নীলা বিরক্ত বোধ করেছে। সকাল আটটার মধ্যেই সিরাজ চলে গেছে ট্রেনিং সেন্টারে। আবার কখন ফিরবে কে জানে। নীলা হোটেলে শুয়ে, বসে, গড়িয়ে আর কতোক্ষণ কাটাতে পারে।

বের হয়ে এদিক–ওদিক দেখলো। বাইরের দোকান থেকে চা খেলো আবার ঘরে এসে শুয়ে থাকলো। কতোক্ষণ পর রুম সার্ভিসে ফোন করে খাবার আনলো। খেতে ইচ্ছে করছে না।

সন্ধ্যা নামার খানিকটা পরে সিরাজ ফিরে এলো।

কি যন্ত্রণা রে বাবা! সবই যেন একদিনে শিখিয়ে দিতে চায়।

তাকিয়ে দেখলো নীলার মুখ ভার, টেবিলে খাবার পড়ে আছে।

একি! খাওনি কেন? মুখে তুলে খাওয়াতে হবে নাকি?

মুখে তুলে খাওয়াতে হবে কেন? ইচ্ছে হয়নি তাই খাইনি।

খাওয়ার ইচ্ছে নেই, তাহলে আনিয়েছো কেন? পয়সা একটু হিসাব করে খরচ করতে শেখো। আয় না করতে পারো, খরচ তো করতে শিখবে। আমার একার আয়, বোঝা উচিত।

ইদানীং সিরাজ তার বন্ধু ডাক্তারদের ডাক্তার স্ত্রীর গল্প খুব করে। বলে নতুন ডাক্তারদের থেকে তার স্ত্রীদের আয় বেশি। স্ত্রী ডাক্তার হলে সংসারে বেশ সুরাহা হয়, ওদিক দিয়ে দেখতে গেলে নীলাই বা কি এমন লাভবান হয়েছে? বড়ভাই তো ঢাকার এক এফসিপিএস–এর সঙ্গে কথা পাকাই করে ফেলেছিলেন।

সিরাজের কিইবা এমন আয়? প্রাইভেট প্র্যাকটিসও গ্রামে গেলে হয় না। শুধু ওর সঙ্গে জীবন জড়িয়ে স্থায়ী দুঃখের পসরা মাথায় নিয়েছে নীলা।

নীলার ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে সিরাজের মনে সহানুভূতির ছায়া নেমে এলো বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কাপড়–চোপড় পরে তৈরি হলো। কাছে এসে আদর করে বললো,

নীলা, চলো বাইরে ঘুরে আসি।

আমি যাবো না।

রাগ করছো?

হ্যা।

কতোটা রাগ? অনেকখানি?

হ্যা।

কয়টা চুমুতে শুষে নিতে পারবো? আমি ডাক্তার। রোগের ওষুধ আমার জানা আছে।

সিরাজ চুমু থেরাপি দেয়ার জন্য এগিয়ে এসে দুই হাতে নীলার মুখখানা তুলে ধরলো।
নীলা হেসে ফেলে বললো – থাক, ওষুধের দরকার নেই। চলো ঘুরে আসি।
এদিক–ওদিক ঘুরে এসে ওরা দুজন একটা শাড়ির দোকানে ঢুকলো। নীলা জানে সিরাজের পকেটে তিন চারশ–র বেশি টাকা নেই। তবু শাড়ি দেখতে বসলো।
ছেলেমানুষী শখ নীলাকে পেয়ে বসে। সে বার বার দামি শাড়ি দেখতে থাকে। একটা শাড়ি খুবই পছন্দ হলে জিজ্ঞাসা করে জানলো শাড়িটার দাম পাচ হাজার টাকা।
এদিকে তাতের শাড়ি দেখো না। সিরাজ বিরক্ত মুখে বললো।
নীলার দৃষ্টি ওই শাড়িতেই আটকে ছিল। সিরাজই পছন্দ করে তিনশ টাকা দিয়ে একটা শাড়ি কিনলো। এমন শাড়ি কিনে কি লাভ? বাসায় তো নীলা সারোয়ার–কামিজই পরে। শাড়ি দরকার হয় পার্টি বা বিয়েবাড়িতে খাওয়ার সময়ে।
তাছাড়া তেমন জমকালো শাড়ি নীলার নেই। এসব শাড়ি সাধারণত বিয়ের সময়ে কেনা হয়। নীলার বিয়েতে দুপক্ষের মতানৈক্যের কারণেই কেনাকাটা তেমন উচু দরের হয়নি।
সিরাজের অল্পদিনের চাকরি, কয় টাকাই বা বেতন, নীলার মন তবু মানে না। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও অনেক কিছু করতে হয়। কষ্ট করেই করতে হয়।
ওই শাড়িটার জন্য মন ভার হয়ে থাকলো নীলার। ওই মুহূর্তে মনে হলো সিরাজের মতো কৃপণ মানুষ আর পৃথিবীতে নেই। একটা ভালো শাড়ি কিনে দিতে পারে না এমন মানুষ বিয়ে করে কেন?
দোকান থেকে বেরিয়ে দুজনে হাটলো। কিছু দূরে এসে সিরাজ বললো, তুমি এখানে একটু দাড়াও, আমি দোকানে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি।
আমি আসি তোমার সঙ্গে?
আহা, একটু দাড়াও না, এক্ষুণি আসছি তো।
সিরাজ ফিরে এলেও খুব কথাবার্তা আর হয় না।
দুই মাস পরে নীলার জন্মদিনের সকালে কুরিয়ার সার্ভিসে নীলার নামে একটা প্যাকেট এলো। নীলা খুলে অবাক চোখে দেখলো সেই শাড়ি। আশ্চর্য সেই শাড়িটা নীলাকে কে পাঠালো? সিরাজকে বললো, তুমি কি ওদের বলেছিলে শাড়ি পাঠাতে?
সিরাজ এড়িয়ে গেল। নীলা ভেবে নিল সিরাজ যা হিসেবি মানুষ এতো টাকা দিয়ে শাড়ি সে কখনোই কিনবে না।
শাড়িটা তো তোমার খুবই পছন্দ হয়েছিল? সিরাজ বললো।
তা তো অবশ্যই।
আমার মনে হয় তোমার মনের ভাব বুঝে দোকানদারই শাড়িটা তোমাকে উপহার দিয়েছে অথবা কোনো বন্ধু।
নীলা ভাবে, এতো টাকা তো সিরাজের হাতে আসেনি তাহলে কিভাবে শাড়িটা কিনলো?
সিরাজ ভাবে, নীলা তার চার বছরের প্রেমিকা, বর্তমানে স্ত্রী, একবারও কি খেয়াল করলো না যে, সিরাজের অতি পছন্দের মুক্তার আংটিটা তার হাতে নেই।

খুলনা থেকে

পরম পূজনীয়

– শফিকুল ইসলাম

তখন আমার বয়স ছয় কি সাত। এক শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম, আমার শার্টটা পিঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে। আমি কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছি। ব্যাপারটা মাকে বললাম। ওনার কথা মতো শার্ট খুলে ফেললাম। আমার পিঠ দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন মা। ব্যাপারটি বোঝার জন্য আয়না হাতে নিয়ে পিঠ দেখলাম। পিঠের অবস্থা দেখে আমার আত্মারাম খাচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। সাবানের ফেনার মতো আমার পুরো পিঠ ফেনাময় হয়ে গেছে। ধবধবে শাদা ফেনা।

এ রোগ আমরা কেউ–ই দেখিনি এবং এ রোগের কি নাম তাও জানি না। আজ পর্যন্তও জানা হয়নি। মা সব কিছু দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন সে টাকাও নেই। তখন আমার বাবা চট্টগ্রামে আর আমরা নোয়াখালীতে থাকতাম। মা উদভ্রান্তের মতো এবাড়ি–সেবাড়ি ঘুরলেন টাকা ধারের জন্য। কিন্তু টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন না। উপায়ান্তর না দেখে মা তার বিয়ের শাড়িটি বিক্রি করে আমার চিকিৎসা করিয়েছেন।

পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন দিগ্বিদিক। আমার পরম পূজনীয় মায়ের এই ঋণ আমি একশবার জন্মগ্রহণ করলেও শোধ করতে পারবো না। আমি ভালোবাসি আমার মাকে, অসম্ভব রকমের ভালোবাসি।

পাহাড়তলী বাজার, চট্টগ্রাম থেকে

কালো রক্ত

– পিয়ারী

শাড়ি। হ্যা, নীল শাড়ি। আমার একটাই শাড়ি। একটা রক্তাক্ত নীল শাড়ি যে শাড়ির ছায়া আমার সারা জীবনকে বেদনায় নীল করে দিয়েছে। আমার বেচে থাকার একমাত্র অবলম্বনই ওই রক্তাক্ত নীল শাড়ি যা আমার জীবনে পরা প্রথম শাড়ি এবং শেষও। না, আর কোনো শাড়ি পরতে পারি না।

১৯৯৮ সাল। কলেজে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি। ভবিষ্যৎ গড়ার হাজার স্বপ্ন দুই চোখে। কলেজে দেখলাম ভালোবাসার ছড়াছড়ি। একটু বন্ধুসুলভ আচরণের পরই ভালোবাসার অফার আসে। তাই নিজেকে খুব গুটিয়ে রাখতে লাগলাম। কিন্তু না, মনকে গুটিয়ে রাখতে পারিনি।

মন নয় মনেরই মতো
সে যে নয়নের অনুগত
তারে বোঝায়ে রাখিবো কতো
সে যে নানান পথে চলে গো।

আমার মন নয়নের সঙ্গে চলে ভালোবাসলো আমাদেরই কলেজের অনার্স পড়ুয়া সুদর্শন, স্মার্ট, সাহসী স্নিগ্ধ নামের একজন ছেলেকে। কিন্তু স্নিগ্ধর নামটা যতো স্নিগ্ধ, তার আচরণ ততোটাই রুক্ষ।

এক কথায় বলা যায়, সে একজন পাতি মাস্তান। কলেজে একদিন একটা বখাটে ছেলে আমার হাত ধরে ভালোবাসি টাইপ কথা বলছিল। কোনোভাবে হাত ছাড়াতে না পেরে চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। দেখলাম স্নিগ্ধ সিড়ি বেয়ে উপরে আসছে। স্নিগ্ধ ছেলেটাকে থাপ্পড় মেরে আমার কাছে ক্ষমা চাইয়েছিল এবং একটা রিকশা ডেকে আমাকে বাসায় ফিরে যেতে বলেছিল। এরপর থেকে স্নিগ্ধ প্রায়ই আমার খোজখবর নিতে লাগলো। এবং একদিন কলেজে না এলে তার কাছে রীতিমতো কৈফিয়ত জারি করতে হতো। একটা নামহীন অধিকার আমার উপর দেখাতো। ছুটির দিনগুলোতে স্নিগ্ধ আমার বাসার সামনের রাস্তায় দাড়িয়ে থাকতো।

একদিন স্নিগ্ধ আমাকে বললো চিরন্তন সত্য কথা ভালোবাসি তোমাকে। প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমিও তখন স্নিগ্ধকে ভালোবাসি। কিন্তু তার মাস্তান হিসেবে পরিচিতির কারণে তাকে বললাম একজন মাস্তানকে আমি ভালোবাসতে পারবো না। সিগ্ধ বললো আমি ভালো হয়ে যাবো, বদলে যাবো যদি আমাকে ভালোবাসা দাও। বললাম নিজেকে বদলে নিয়ে এলে ভালোবাসা চাইতে হবে না। স্নিগ্ধ বললো আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আমি আসবোই।

স্নিগ্ধ আস্তে আস্তে মিছিল মিটিং থেকে সরে গেল। অনেকে তাকে দলে ফিরতে বলেছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সে ফিরে যায়নি। ঠিক সময়ে, ভদ্রছেলের মতো ক্লাসে আসতো, ক্লাস শেষে সোজা বাড়ি যেতো। পড়ালেখায় মনোযোগী হয়ে উঠলো। আমার জন্য স্নিগ্ধ–র এই পরিবর্তন আমাকে আশ্চর্য করেছিল। অনার্সে খুব ভালো রেজাল্ট করলো। স্নিগ্ধ আমাকে টি–বাধে দেখা করার জন্য অনুরোধ করলো। আমিও তার ভালোবাসা পাবার জন্য অস্থির হয়েছিলাম।

অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। শাদা টি শার্ট ব্লু জিন্স পরে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ও একটি লাল গোলাপ হাতে সে যখন আমার সামনে দাড়ালো তখন স্নিগ্ধর স্নিগ্ধতার তীব্রতা আমাকে মোহিত করে দিয়েছিল। খোলা দিগন্ত এবং সামনে বিস্তৃত পদ্মার পাড়ে আমরা পাশাপাশি বসলাম। সে প্রথমে আমার হাতটা ছুয়ে দিল। একটু স্পর্শে আমার হৃদয়–মন ভরে উঠলো। ভালোবাসার আবেশে কখন এবং কতোক্ষণ তার বুকে মাথা রেখে বসেছিলাম জানি না। স্নিগ্ধ আমার মাথাটা তুলে আমার ঠোটে আলতো একটা চুমু দিয়ে বললো, সূর্য অস্ত গেছে, ফিরতে হবে সোনামণি।

এভাবেই স্বপ্নময় দিনগুলো যেতে লাগলো।

সারাটা দিন অপেক্ষায় আছি। কখন স্নিগ্ধ আসবে। কারণ আজ আমার জন্মদিন। দিন শেষে একগোছা গোলাপ ও একটা প্যাকেট এলো তার বন্ধুর হাত দিয়ে। ও না আসাতে রাগে দুঃখে কান্না পাচ্ছিল। প্যাকেট খুলে দেখি আমার অতি প্রিয় নীল রঙের একটা শাড়ি, সঙ্গে একটা চিরকুটে লেখা,

সোনামণি,

রাগ করো না লক্ষী। নীল পরীকে দেখার অপেক্ষায় থাকলাম আগামীকাল বিকাল চারটায় পদ্মার তীরে।

স্নিগ্ধ

মাকে বললাম, বান্ধবীর সঙ্গে ছবি তুলতে যাবো। তাই শাড়ি পরলাম এবং বান্ধবীর শাড়ি। ছোটবোন ব্যাপারটা জানতো। সে দুষ্টুমিতে ভরা হাসি দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে বললো। প্রথম শাড়ি পরাতে

শাড়ি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলাম যেমন তেমনি লজ্জাও লাগছিল। তবুও ভালোবাসার টানে লাজ, ভয় ভুলে ছুটে গেলাম।

স্নিগ্ধ আমাকে পাশে বসিয়ে মুগ্ধ নয়নে দেখছিল। স্নিগ্ধ জানতো যে, প্রতিদিনের মতো ওই দিনও আমি ছোট কালো টিপ পরে আসবো। স্নিগ্ধ পাগলা পবনে এলোমেলো চুলগুলো আলতো হাতে কপাল থেকে সরিয়ে কালো টিপের বদলে একটা নীল টিপ পরিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে ভালোলাগার যে অনুভূতি তা ভোলা অসম্ভব। স্নিগ্ধ অনুযোগের সুরে বললো একটু কাছে আসতে। নীরব দেখে সে হঠাৎ করে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। এক সময় স্নিগ্ধ আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। ছটফট করতে লাগলাম তার শক্ত বাধনের মধ্যে। আমার পেটের অনাবৃত অংশে ও নাক মুখ ঘষতে লাগলো। উত্তেজনায় কেপে কেপে উঠলাম?। চরম ভালোবাসা আমাকে শিহরিত করে তুলছিল। আমিও ব্যাকুল হয়ে স্নিগ্ধকে আকড়ে ধরলাম। চুমুতে চুমুতে আমাকে ও পাগল করে তুললো। অজানা হাজার ভালোগালার স্পর্শে কখন যে সূর্য অস্ত গেল সেদিনও বুঝতে পারিনি। স্নিগ্ধই এক সময় আমাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনলো। শেষবারের মতো ও আমাকে ওর ঠোটের তপ্ত লবণাক্ত স্বাদ দিয়ে বললো, ফিরতে হবে।

সন্ধ্যা হওয়াতে হন্ডাতে করেই বাসায় পৌছে দিতে চাইলো। বাধের পাশে নির্জন রাস্তাতে জোরে চালাচ্ছিল। বারণ শোনেনি। হঠাৎ একটা মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি। জ্ঞান ফিরে দেখলাম নীল শাড়ি রক্তে ভেজা, স্নিগ্ধও রক্তে ভেজা। স্নিগ্ধ আর নেই। স্নিগ্ধকে শেষবারের মতো দেখতে দেয়নি আমাকে।

শাড়িটা আজো আছে। লাল রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে ঠিক যেন নীল আকাশের বুকে লেপ্টে থাকা কালো মেঘ। প্রিয় নীল আকাশ আর ভালোলাগে না। মেঘহীন নীল আকাশেও দেখতে পাই জমাট বাধা পুরনো রক্তের দাগ। স্নিগ্ধ বলতো আমার হাসিতে চাদও হেসে উঠে। আজ আমার স্নিগ্ধ নেই, হাসিও নেই। আছে শুধু বুকভরা কান্না, ভালোবাসার অমূল্য কিছু স্মৃতি এবং রক্তের কালো দাগে নীল একটা শাড়ি।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
রাজশাহী থেকে

কঠিন অসুখ

– সাথী

ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের স্কুলে প্রতি বছর ফিস্ট মানে বার্ষিক ভোজের আয়োজন হতো। গার্লস হাই স্কুল হওয়ায় মেয়েরা সেই ফিস্টের দিনটাতে নানান রঙের সাজে সজ্জিত হয়ে স্কুলে যেতো। ফিস্ট হতো আমাদের স্কুলের ভেতরেই। বেশির ভাগ মেয়েই শাড়ি পরে যেতো। আমাদের বাসায় কোনো ভালো শাড়ি ছিল না। আর বোনদের শাড়ি পরে যে যাবো তার কোনো উপায় ছিল না। কারণ তারা ছিল যে যার শ্বশুরবাড়িতে। আশপাশের বাসায় কারো কাছে শাড়ি কেন, কোনো কিছুর জন্যই কখনো যাইনি।

আমি আর আমাদের পাড়ার আরেকটি মেয়ে আমরা এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম। আমার সমস্যাটা শোনার পর সে নিজে থেকেই বললো যে, তার মায়ের সুন্দর শাড়ি আছে। তো ফিস্টের আগের দিন বললো যে, আপনি সন্ধ্যার সময় আমাদের বাসায় যাবেন, আমি আম্মুর শাড়ি দেয়ার ব্যবস্থা করবো। সন্ধ্যার সময় আমি আর আমার বোন মিলে তাদের বাসায় গেলাম। তার আম্মু শাড়ির কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর তিনি এই বলে আমাকে বোঝালেন যে, ওনার খুব কঠিন একটা অসুখ আছে। তাই ওনার শাড়ি তিনি কাউকে পরতে দেন না যদি অন্য কারো সেই অসুখটা হয় এই ভয়ে।

কারো কাছে কোনো কিছু ধার করার অভ্যাস ছিল না। তাই চাইতে গিয়ে না পেয়ে সেদিন কি লজ্জাটাই না পেয়েছিলাম।

পূর্ণঠিকানাবিহীন, ময়মনসিংহ থেকে

লাইফ ইজ এ ...

– এমএ মালেক

মেয়েদের একটি দুর্বলতার নাম শাড়ি। মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন সংসারে এ নিয়ে কতোই না মান–অভিমান ও ছন্দপতনের ঘটনা ঘটে। এটি নিয়ে কিছু অতীত ও বর্তমান সুখ–দুঃখ প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই থাকার কথা! আমার জীবনেও আছে। জীবন সায়াহ্নে সেই কথাই বলবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপের এক পর্যায়ে কলকাতা থেকে আগত সুঠামদেহী অজিতবাবুর তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও দুটি আখড়া (ক্লাব) স্থাপিত হয়। প্রথমটি মধ্যপাড়াস্থ জুবিলী প্রেসের কাছে জগুরমার বাড়িতে (বর্তমানে মসজিদ)। এবং দ্বিতীয়টি উত্তর ফুলবাড়িয়া কাংগালনাথের বাড়িতে। আখড়াগুলো উচু মুলিবাশের বেড়ায় ঘেরা ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঐতিহ্যবাহী হিন্দু–মুসিলম সম্প্রীতি রক্ষাকারী স্থান হিসেবে প্রয়োজনের তাগিদে সে সময়ে চারজন মুসলমানকে সদস্য করা হয়। ওই চারজনের মধ্যে দুইজন প্রয়াত, বাকি দুজনের মধ্যে শেরপুরের মাতু মিয়া (জীবিত))। এবং অপরজন আমি। সেখানে নিয়মিত ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা হতো। নেতাজি সুভাষ বসুর সংগ্রামী জীবনী ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ছোট ছোট বই পড়তে দেয়া হতো। ছুরিখেলার বোল ছিল – তামাশা, বাহারা, শির, কটি, ভাণ্ডার, হোল। সঙ্গীত ছিল, চল–চল–চল দিল্লি, চল লালকেল্লা–পাগারকে এগিয়ে চল এগিয়ে চল। ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে অজিতবাবু কলকাতায় চলে যাওয়ায় আখড়াগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যায়াম ও কুস্তির প্রতি আমার একটা বিশেষ আকর্ষণে প্রথমে অজিতবাবু এবং পরবর্তী কালে সর্বজনাব কেরামত আলী পালোয়ান ও মগু মিয়া পালোয়ানের ট্রেনিংয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি একজিবিশনের কুস্তি প্রতিযোগিতায় পর পর দুইবারের জয়ী বিহারি পালোয়ানকে হারিয়ে জয়ী হলাম। সে কি আনন্দ! ছোটবেলায় পিতার কাধে বসে পাইকপাড়ায় নির্বাক টকি দেখা। নৌকায় চড়ে মেঘনা নদীতে নতুন পুল দেখতে যাওয়া। সাবেক মন্ত্রী হুমায়ুন আহাম্মদের দাদার লম্বা লাল হলুদের কোষা নৌকা যেটি বড় বড় সরোংগা নৌকার সঙ্গে বাইচ দিতো। আরো কতো কি? গল্পের সূচনায় ভূমিকা

হিসেবে আমার অল্প বয়সের তৎকালীন কিছু স্মৃতি মনে হলো তাই লিখলাম। পাঠকরা দয়া করে কেউ ভুল বুঝবেন না। চাকরি জীবনে প্রথমে আইজিপি অফিস এবং পরে একটি আধা সরকারি সংস্থা থেকে উপপ্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করি।

এবার শাড়ি প্রসঙ্গে মূল ঘটনায় আসি। ঢাকায় আসার আগে এক দূরসম্পর্কীয় নানার বাসায় টিউশনির সময়ে নানাজি একদিন হাসতে হাসতে বললেন, শিলং থেকে আগত ওনার এক নাতি দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে দামি শাড়ির কিছু অংশ ছিড়ে ফেলেছে। তুমি তো নাতি। তাই তোমাকেই থানাপুলের কাছে নদীয়া শাল রিপেয়ারিং হাউস থেকে রিপু করিয়ে আনতে হবে। ঘরের অপর পাশে বোমা কণ্ঠে চাপা হাসাহাসির আওয়াজ।

আমি লজ্জায় নীরব। শাড়িটি বিদেশি জর্জেট, খয়েরি রঙ, নরম-মোলায়েম এবং দেখতেও বেশ সুন্দর লাগছে। যথাযথভাবে রিপুর কার্যাদি সুসম্পন্নের পর শাড়িটির সুচারু রিপু দেখে সবাই খুব খুশি। খুশি শাড়ির মালিকও। এরপর শাড়ির মালিকের সঙ্গে দূর থেকে দেখাদেখি ও চোখাচোখি হতো, কোনোদিন কথা হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে ঢাকায় চলে এলাম এবং চাকরিও পেলাম। পরবর্তী কালে অনেক ঘটনা ঘটলো।

এরপর বিধাতা ও অভিভাবকদের ইচ্ছায় ১৯৫১ সালে বিয়ে বন্ধনে আবন্ধ হলাম এবং ওই শাড়িটিও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে দেয়া হলো। ওই শাড়িটি যতোদিন আমাদের মাঝে ছিল ততোদিন মোটামুটি সুখেই ছিলাম। এক সময়ে অযত্ন, বেখেয়াল, অবহেলা ও অবমূল্যায়নের দরুণ উভয়ের মধ্যে বিয়েপূর্ব নীরব ভালোলাগা এবং ভালোবাসা সেতুবন্ধনকারী ওই শাড়িটি নষ্ট ও অস্থিত্বহীন হয়ে যায়।

শুনেছি প্রত্যেক বস্তুরই একটা আত্মা থাকে। আহত শাড়িটি আমার আন্তরিক সেবায় ভালো হওয়ার প্রতিদানে মনে হয় আমার প্রতি সদয়ের নির্দশন স্বরূপ প্রতি মাসে নতুন সাজে ও নতুন রঙে আমার সংসারে আগমন বহাল রেখেছে। আমার স্ত্রী কষ্ট করে এদিক-সেদিক থেকে হাতে সামান্য সঞ্চয় হলে অন্য কিছু না কিনে প্রতি মাসে একটি নতুন শাড়ি কিনতেই বেশি পছন্দ করে। টাকার টান থাকলে শাড়ি বিক্রেতার মাধ্যমে দুটি পুরনো শাড়ি বদল করে একটি নতুন শাড়ি কেনা হয়। প্রশ্ন করলে বলে, এটা তো আমার ভাগ্য! কারণ আমার যে *শাড়ি রাশি।*

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বারো রাশির কথা জানতাম। শাড়ির যে রাশি হয় তা নতুন জ্ঞান পাই। চমৎকৃত হই। চুপ করে যাই।

সম্প্রতি অনেক বছর পর একনাগাড়ে আট দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অবস্থান করে পিতৃ সম্পত্তিগুলো ভাইবোনদের মধ্যে যথাযথভাবে ভাগ-বাটোয়ারার পর আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে ২৪ এপ্রিল ২০০২ ঢাকায় ফিরে ক্লান্ত শরীরে বিকেলে এই লেখাটিতে ঘষামাজা করছি এমন সময় কলিংবেল। দরজা খুলে দেখলাম শাড়ি বিক্রেতা মনোরমা ভুবন মোহিনী হাসিতে বললো, খালাম্মার জন্য দুটি শাড়ি এনেছি। খালাম্মাকে খুবই মানাবে। মহা বিপদ সঙ্কেত। আমাকে নীরব দেখে পুনরায় বললো, খালাম্মার আর কতো বয়স?

বললাম, আমার ৭৪ আর তোমার খালাম্মার ৭০।

মনোরমার চোখে কপট অবিশ্বাস। বলেন কি? খালাম্মার বয়স তো মাত্র পয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ মনে হয়।

হতে পারে! ভাবলাম আমার বড় ছেলের বয়সই ৪৮।

সে বললো, খালুজান আমাদের দুঃখ–কষ্ট কেউ বুঝতে চায় না। এই শাড়ি বিক্রির টাকায় বাড়ি ভাড়া, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ও সংসার খরচ কোনোমতে চালাই। এদিকে আগামীকাল এনজিও অফিসের সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা জমা দিতেই হবে। না হলে মহা বিপদ।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছু ভেবে হাসিমুখেই নগদে একটি শাড়ি রাখলাম। ভাবলাম মনোরমার হাসিমাখা মুখের আড়ালে কতোই না দুঃখ–কষ্ট, জীবনযাপনের বিড়ম্বনা। শাড়িটির নাম *পরাগ শাড়ি।* খুবই সুন্দর নাম।

মনে হলো একটি শাড়িতে তিনজনই খুশি – আমি, স্ত্রী ও মনোরমা। আরো ভাবলাম, লাইফ ইজ এ সিরিজ অফ এডজাস্টমেন্ট। জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি জীবনের একটি উজ্জ্বল আলো। এবং রোমান্টিসিজম, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিক মানসিকতা এর মুক্ত দুয়ার। তা না হলে জীবন সংসারে দুঃখ–কষ্টের বোঝা কেবল বাড়বেই।

বাসাবো, ঢাকা থেকে

উপলক্ষ

–মোহাম্মদ হারুন–অর–রশিদ

ঈদ বোনাস পেয়ে প্রথম যে কাজটি করি তা হলো, আমার মায়ের জন্য পছন্দ মাফিক একটা শাড়ি কিনি। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা এ দুই ঈদে মায়ের জন্য শাড়ি কিনি।

মায়ের হাতে যখন শাড়িটা দিই, মা প্যাকেট খুলে শাড়িটা বের করে জমিনে হাত বুলিয়ে বলবেন, কতো নিয়েছে। তার উত্তরে বলি, মা, তোমার পছন্দ হয়েছে?

মা তখন বলবেন, শুধু শুধু কতোগুলো টাকা খরচ করলি, আমার তো অনেক শাড়ি।

মা এর একটু পর বাড়ির সবাইকে এক এক করে ডেকে শাড়ি দেখিয়ে বলবেন, হারুন, আমাকে ঈদের শাড়ি দিয়েছে, কি সুন্দর না! বাচ্চাদের মতো মায়ের চোখে মুখে আনন্দ।

তারপর প্রতিবেশীদের দেখাবেন, এভাবে চেনাজানা সবাইকে দেখাবেন। মায়ের আনন্দ, মায়ের এই খুশি অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। মায়ের আনন্দ এবং খুশি শাড়ির জন্য নয়। মায়ের হৃদয়ের গভীরে যে আনন্দ তা তার সন্তানের জন্য, তার বুকের ধনের জন্য, এখানে শাড়ি একটা উপলক্ষ মাত্র।

হাজি মহসিন রোড, খুলনা থেকে

দোলন

–মোহাম্মদ হযরত আলী

শাড়ি শুধু নারীর শরীরই ঢাকে না, মানুষের জীবনও বাচায়। মেজখালার মেয়ে হাংগার স্ট্রাইক করেছে। তার এক দফা এক দাবি, তাকে নিয়ে নৌভ্রমণে যেতে হবে। বোনাস দাবি অনুযায়ী, নৌকার মাঝি হবো আমি আর যাত্রী হবে সে। অবশ্য দোলনের দাবির এই নিগূঢ় বক্তব্যটা শুধু আমিই জানি। অন্য সবাই জানে, কথা প্রসঙ্গে তার অপ্সরী মার্কা চেহারাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাকে পেতনির

দাদিশাশুড়ি বলেছি তাই সে খাচ্ছে না। বাড়ির সবাই একে একে যে যার সাধ্য মতো প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোলনকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু তার এক কথা, বেগুন এসে সরি বলে রিকোয়েস্ট না করলে আমি না খেয়ে মরে গেলেও একটি দানা মুখে তুলবো না।

দোলন আমাকে বেগুন বলে ডাকে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, বেগুন যেমন মানুষের দেহে এলার্জি ক্ষমতা বাড়িয়ে শরীরে চুলকানি জনিত ক্ষতের সৃষ্টি করে তেমনি আমার অসৌজন্যমূলক আচরণও নাকি তার মনে কষ্টের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

অদ্ভুত এক নারী চরিত্র আমাদের এই দোলন। কখন কি করে বসে আর কখন কি বলে ফেলে তার কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। অথচ আমার গর্ভধারিণী মা দোলনের পক্ষ নিয়ে তার আওয়ামী চরিত্রের অনশন কর্মসূচিকে সমর্থন করে আমার কান টেনে ধরে কিছুটা শাসন মিশ্রিত স্বরে বললেন, এই ত্যাদোড় দোলাকে তুই কি বলেছিস, বলতো। সেই সকাল থেকে মেয়েটা মুখে এক ফোটা পানিও নেয়নি। কতো লক্ষ্মী মেয়ে আমার। কতো ভালো ছাত্রী সে। পরীক্ষা দিয়ে মাত্র দুই চার দিনের জন্য খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। আর তুই কি না সারাক্ষণ ওর পেছনে জোকের মতো লেগে আছিস? যা, এক্ষুণি যা, জলদি ওর রাগ ভাঙা। না খেয়ে তো দেখছি মেয়েটা ওর শরীরে অসুখ বাধাবে। যদি রাগ ভাঙাতে না পারিস তাহলে তোর কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে এই আমি বলে গেলাম।

মায়ের সতর্ক বাণীতে সাংবিধানিক ক্ষমতার কাছে অসহায় সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বহু বিতর্কিত জাতির পিতার পরিবার সদস্যদের নিরাপত্তা আইন পাস করার মতো দোলনের কাছে নতি স্বীকার করলাম। দোলন আমাকে ক্ষমা করলো এবং ভরপেট পোলাও–মাংস খেয়ে তার সুবিধা আদায়ের অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু একই সঙ্গে আমাকে মনে করিয়ে দিল, আবারও যদি আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার মতো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঋণখেলাপি সালমান এফ রহমানের মতো কথার খেলাপ করে আগামীকালের মধ্যে তাকে নৌভ্রমণে না নিয়ে যাই তাহলে সে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে আবারও হাংগার স্ট্রাইক করবে। সুতরাং তার ইচ্ছা পূরণ হলো।

দোলনকে নিয়ে নৌভ্রমণে গেলাম। ভরা বর্ষার পানিতে নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দে দোলন যেন আত্মহারা হয়ে গেল। নদীর দুই কূলে যা কিছু দেখছে তাই তার কাছে সৌন্দর্যের আধার হিসেবে মনে হচ্ছে। দোলনকে আজ অপূর্ব লাগছে। লাল পাড়ের সবুজ শাড়ি পরে সে নৌকার বিপরীত মাথায় আমার মুখোমুখি বসেছে। মেকআপ ছাড়া কোনো মেয়েকে শুধু একট শাড়িতে এতো সুন্দর লাগতে পারে তা আমার জানা ছিল না। এই প্রথম আবিষ্কার করলাম জন্মসূত্রে পাওয়া দোলনের বাশির মতো খাড়া নাকের ঠিক উপরে কালো যে তিলটি রয়েছে তা সবার অজান্তে দোলনের সৌন্দর্য বর্ধক টিপের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সত্যি, দারুণ লাগছিল দোলনকে। দোলন তার সুরেলা কণ্ঠে গান ধরেছে– *ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে...*। আমি যেন তার সুরের ভুবনে হারিয়ে গেলাম। এ এক অন্য রকম অনুভূতি।

আমাদের নৌকা শাখা নদীর বুক চিরে বিশাল পদ্মার বুকে গিয়ে পড়লো। এমন সময় দূর থেকে এক বৃদ্ধ জেলে আমাকে উদ্দেশ্য করে জোরে চেচিয়ে যে কথাগুলো বললো তার বক্তব্য হলো, এই ছেলে,

তুমি নৌকার পাল তুলে দিচ্ছো না কেন? তাড়াতাড়ি তোমার নৌকার মোড় স্রোতের বিপরীতে ঘুরিয়ে নাও। তা না হলে সামনের স্রোতের পাকে পড়ে তুমি তোমার নৌকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না। তোমরা দুজনেই নৌকাসহ মৃত্যু পাকে তলিয়ে যাবে।

লোকটির কথা শুনে মুহূর্তেই আমার শরীর গরম হয়ে উঠলো। হার্টবিট বেড়ে গেল। দোলন গান থামিয়ে আমাকে চেপে ধরে কান্না জুড়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি নৌকার পাল তুলে দিলাম। কিন্তু নৌকার পালে যে পরিমাণ বাতাস আটকালো তাতে নৌকা স্রোতের বিপরীতে এক ইঞ্চিও এগোলো না। উল্টো আমার ভীত–সন্ত্রস্ত হাতে বৈঠার নাড়া–চাড়ায় নৌকা ঘুরতে ঘুরতে স্রোতের অনুকূলে যেতে থাকলো। কারণ নৌকার পালে ছোটখাটো বহু ছিদ্র ছাড়াও পালের মাঝখানে খাড়াখাড়িভাবে প্রায় পাচ ফিট ছেড়া ছিল। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। নিশ্চিত করুণ পরিণতির কথা ভেবে বিবেক–বুদ্ধি সব হ্রাস পেতে থাকলো। এমন অবস্থায় দোলন আমার শার্টটি চেয়ে নিয়ে তার শরীরের অর্ধাংশ জড়িয়ে তার শাড়িটি খুলে দিল। এবং বললো, এটি পালের ছৈড়া বরাবর নৌকার পাটাতন বাধা তার দিয়ে আটকিয়ে দাও। দোলনের কথা মতো কাজ করে আবার পাল তুলে দিলাম। দোলনের উপস্থিত বুদ্ধিটি দারুণ কাজে লাগলো। এবার নৌকার পালে পর্যাপ্ত বাতাস আটকালো। আমি নৌকার গতি স্রোতের বিপরীতে দিয়ে বাড়ির দিকে বৈঠা ধরলাম। দোলন আমার পাশে বসে বাম কাধে মাথা রেখে আকাশের দিকে মুখ করে চোখ বুজে আছে। বোধ হয় গুন–গুনিয়ে গান করছে। আমিও নিজের অজান্তে সন্তুষ্টি কামনা করলাম।

থ্যাংক গড। দোলনের বুদ্ধিতে এ যাত্রায় বেচে গেলাম। দোলন আমার কথা শুনে একটি তৃপ্তির হাসি উপহার দিল।

ইসলামপুর, ঢাকা থেকে

সুন্দর দৃশ্য

– খন্দকার জিয়া হাসান

বছর বিশেক আগের কথা। তখন সম্ভবত ক্লাস সেভেন কিংবা এইটে পড়ি। একদিন সকালে ড্রয়িংরুমে বসে পড়ছি। সাধারণত দরজা খুলে পাশে বসে পড়তাম। তাতে করে বাগানের অনেকটাই দেখা যেতো। এটা ছিল বায়ান্ন বছর আগে আমার দাদার কেনা ছয় বিঘার বাগানবাড়ি। যে সময়টার কথা বলছি তখন বাড়ির চারধার ঘেরা ছিল না। ফলে যখন তখন লোকজন বাগানে ঢুকে পড়তো। হয়তো বাড়িটার ডান দিকের রাস্তার লোক বাড়িটার বাম দিকের রাস্তায় যাবে, না ঘুরে সোজা বাগানের মাঝখান দিয়ে চলে যেতো। আবার অনেকে গরু–ছাগল নিয়েও ঢুকে যেতো বাগানে ঘাস খাওয়ানোর জন্য।

দরজা খুলে বসে পড়াশোনার পাশাপাশি এসব লোকজনদেরও একটু ধমক–ধামকি দিতাম অনধিকার প্রবেশের জন্য। সেই সকালেও যথারীতি পড়ছিলাম এবং মাঝে মধ্যে বাগানের দিকে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা দৃশ্যে ফ্রজ হয়ে গেলাম। বাগানের মধ্যে দিয়ে একজন মহিলা হেটে যাচ্ছে। পুরোপুরি নগ্ন। স্বচোখে তো দূরের কথা, স্থির ছবিতেও এর আগে কখনো নগ্ন কোনো মহিলাকে দেখিনি।

আমার যে অনুভূতিটা হলো তা হচ্ছে, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম যদি আম্মা আমাকে সেই নগ্ন মহিলার দিকে তাকানো অবস্থায় দেখেন তবে কপালে নির্ঘাত মার আছে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা লাগাতে গেলাম। ঠিক লাগিয়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে দরজার দুই পাল্লার ফাক দিয়ে দেখি আম্মা দৌড়ে বাগানের দিকে যাচ্ছেন। হাতে একটা ভাজ করা শাড়ি। আবার দরজা খুলে ফেললাম। আম্মা এক মুহূর্তে সেই মহিলার কাছে পৌছে গেলেন এবং শাড়িটা খুলে মহিলাটিকে জড়িয়ে দিলেন। এক মিনিট আগেও যেদিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম, এখন মনে হচ্ছিল এটাই পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর দৃশ্য।

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাটা শুধু কিছুক্ষণ আম্মার দিকে তাকিয়ে রইলো, কিছুই বললো না। তারপর আবার হাটতে লাগলো। এই হচ্ছে আমার মা যার নিজেরই তখন খুব বেশি শাড়ি ছিল না। বিটিএমসি–তে কর্মরত সৎ অফিসার আমার আব্বার পক্ষে খুব বেশি বাহুল্য খরচ করা সম্ভবও ছিল না।

আমার আম্মার এখন অনেক শাড়ি। আল্লাহ আমাকে সৎভাবে উপার্জন করার এবং মাকে শাড়ি কিনে দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে আম্মাও তার দানের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রেখেছেন।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ঘৃণ্য

দুটি বেনারসি শাড়ি কিনেছিলাম বিয়ে এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য। বিয়ে করেছিলাম বাংলাদেশের একজন নামি লোকের বোনকে। কিন্তু তাদের অহঙ্কার এবং আমার প্রবাসে থাকার কারণে সম্পর্কের দূরত্ব ও জটিলতা এবং শেষে বিচ্ছেদ। প্রবাসে পরিচিত লোকজনদের কাছে কথাটি গোপন রাখলাম। তবে সবাই যখন প্রশ্ন করতো ভাবীকে কবে আনবেন? প্রশ্ন এড়াতে মিথ্যা বলতে হতো। দেশে গিয়ে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম আবার সংসার করতে চেষ্টা করবো, একজন বাবা হবো। পাত্রী নির্বাচিত করলাম গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারে একটি মেয়েকে। ভাবলাম অন্তত অহঙ্কার বোধ থাকবে না। কিন্তু গ্রাম্য প্রবাদের মতো – *আমি যেখানে গেলাম আমার কপাল সঙ্গেই গেল।*

আমার অতীত জীবনের সব কথাই পাত্রীকে বললাম এবং তাকে ভালোভাবে চিন্তা করতে বললাম যে, সে একজন বিবাহিত লোককে বিয়ে করতে যাচ্ছে যাতে পরবর্তী কালে তার মনে কোনো ধরনের আক্ষেপ না আসে।

সে বললো, তার বড় বোন দুই বাচ্চা রেখে স্বামীর সংসার ছেড়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে চলে গেছে, যার শোকে তার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। এ জন্য ভালো কোনো পাত্র আসে না। সে সম্মত। মর্মাহত হলাম। তাকে তার বোনের সঙ্গে বিচার করলাম না। চলে এলাম প্রবাসে। মুরুব্বি পর্যায়ে আলোচনায় মতৈক্য হলো। আমার ইচ্ছায় অনাড়ম্বর এবং টেলিফোনে বিয়ে হলো। শাড়ি–গহনা যথেষ্ট দেয়া হলো। শুধু ঘটা করে বিয়ে হলো না।

তাদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠলো তারা আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চায়। বাধ্য করলো আমাকে আবারও বিয়ের পাগড়ি পরতে। দেশে এলাম, বিমানবন্দরে আমার টেলিফোনে বিয়ে করা স্ত্রী আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলো।

আমাদের একজন তাকে সৌজন্যসুলভ আমন্ত্রণ জানালো আমাদের সঙ্গে আসার জন্য। তখনো তাকে আমাদের বাড়িতে উঠিয়ে আনা হয়নি। সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়িতে উঠলো। বাসায় এসে বিদেশ থেকে আনা প্রতিটি জিনিস নির্লজ্জের মতো দেখতে চাইলো। এক পর্যায়ে আমার আলমারি খুলে প্রথম স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কার দেখে তার চোখ ছানাবড়া। আমি তার চোখে মুখে এক ঘৃণ্য লোভ দেখতে পেলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম স্ত্রীর বক্তব্য ছিল যার সংসার করবো না তার জিনিস নেবো কেন। তাই গহনা সে নিয়ে যায়নি। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, এগুলো বিক্রি করে ভালো কাজের জন্য দান করবো। কারণ এগুলো অন্যের ব্যবহৃত।

সে বললো, আমি যাকে বিয়ে করেছি সেও তো ব্যবহৃত।

এভাবেই সে আমার ক্ষত জায়গায় আঘাত শুরু করলো দারণভাবে মর্মাহত হলাম। কিন্তু চেপে গেলাম। পুরনো শাড়ি, গহনা সবই সে নিল। তার জন্য নতুন কেনা গহনার একটি অংশ আমিন জুয়েলার্সে বিক্রি করে দিলাম, নতুন শাড়ি ফেরত দিলাম এবং অনুষ্ঠানের দিন প্রথম বিয়ের শাড়ি দিলাম যা নাকি জ্বলন্ত অভিশাপ হয়ে আজো আমাকে পুড়িয়ে মারে। এ কথায় পরে আসছি।

দুই সপ্তাহ দেশে থেকে চলে এলাম এবং তিন মাসের মধ্যে আমার স্ত্রীকে ইটালি নিয়ে এলাম। এই তিন মাস সে আমাদের বাড়িতে মা–বোন–ভাইদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা যদি তখন জানতে পারতাম তাহলে হয়তো আমার সন্তান এই অভিশপ্ত সংসারে জন্ম নিতো না। আমার অতীতের বিয়েকে আমার পরিবার একটি বিরাট দুর্বলতা মনে করে। আমার দ্বিতীয় সংসারে যাতে কোনো রকম ঝামেলা না হয় সে জন্য তারা সব চেপে গিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার স্ত্রীকে আমার কাছে পাঠানোর তদবির করেছে। ভেবেছে স্বামীর কাছে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে আসার পর তার নোংরা, নির্লজ্জ স্বভাবের বহিঃপ্রকাশে অনেকেই হতবাক এবং মর্মাহত। সে সবার সামনে আমাকে অপমান অপদস্থ করা শুরু করলো। অন্যায় আবদার শুরু করলো। তার কোনো আবদার রক্ষা না করলে উঠতে বসতে বলতো, বিবাহিত বেটা আমাকে পুরনো শাড়ি দিয়ে বিয়ে করেছিস, অবিবাহিত ছেলে বিয়ে করলে অনেক কিছু পেতাম।

তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করতাম। পুরনো শাড়ির জন্য সেই দায়ী আর বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে টেলিফোনে বিয়ের সময় তাকে নতুন শাড়িই দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পুরনো গহনার কথা কখনো সে বলে না।

তাকে খুশি করার জন্য অবসর সময়ে ঘুরতে নিয়ে যেতাম ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রিমিনি, সান মারিনো মিলানা, জুরিখ, জেনেভা। কিছুতেই কিছু হতো না। তার একই কথা, বিবাহিত লোককে বিয়ে করে ভুল করেছে। তাকে ভুল সংশোধনের পথ দেখতে বলি। সে চাকরি করতে চাইলে চাকরির ব্যবস্থা করলাম।

চার মাসের মাথায় হাস্যকর অভিযোগ তুললো, আমি বন্ধ্যা। আমার বাচ্চা হবে না। পরবর্তী কালে যখন অন্তঃসত্ত্বা হলো তখন সে বললো, বাচ্চা নেবো না।

তখনো যদি তার কথা মতো এবরশন করিয়ে ফেলতাম তাহলে হয়তো একটি প্রাণ পৃথিবীতে এসে কষ্ট পেতো না। তার কথা শুনে কাজ করলে পরবর্তী কালে সে দেশের আত্মীয়দের উল্টো কথা বলতো এবং আমাকে দায়ী করতো। তাই তাকে তার মতামত দেশে জানাতে বললে সে চুপ হয়ে যায়।

প্রতীক্ষার পর আমাদের একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান হলো। সন্তান প্রসবের সময় ডাক্তার–নার্সদের সঙ্গে আমিও পাশে ছিলাম। নার্স যখন বাচ্চা তার মায়ের কোলে দিতে চাইলো তখন নার্সকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে নার্স–ডাক্তার আমার দিকে তাকালো, তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ বোধ করছে। তারা বিশ্বাস করলো কি করলো না জানি না। তবে কন্যা সন্তান হওয়ার জন্য আমাকে দোষারোপ শুরু করলো আমার স্ত্রী যা নাকি আমাদের দেশে অনেক অজ্ঞ পুরুষরা স্ত্রীকে করে থাকে।

এমন সব নোংরা উদাহরণ দিতে থাকলো যা থেকে তার এবং তার পরিবারের লাজ–লজ্জার সীমা পরিসীমা বোঝা যায়। সে বলে তার বোন দুইজন কন্যা সন্তান হওয়ার পর অন্য পুরুষকে বিয়ে করাতে ছেলে হয়েছে। রুদ্ধশ্বাস এবং মনের কষ্ট মনে চেপে সময় গুণতে লাগলাম দেশে যাওয়ার। দেশে গেলাম। দেশে গিয়ে যখন সে বুঝতে পারলো তাকে আপাতত সঙ্গে আনছি না তখন একদিন সামান্য ব্যাপারে হই হই করে প্রতিবেশীদের জড়ো করে আমার চরিত্র সম্পর্কে কুৎসিত কথাবার্তা বলতে শুরু করলো।

তার ভাইয়েরা এলে সে তার সব কিছু নিয়ে ভাইদের সঙ্গে চলে গেল। আমরা পত্রিকার শিরোনাম হওয়ার ভয়ে নীরবে চেয়ে দেখলাম। আমার স্ত্রী আমার মায়ের গায়ে হাত তুলেছে। প্রতিউত্তরে মা–বোনরা কিছুই বলেনি। কারণ আমার স্ত্রী মাঝে মধ্যে হুমকি দিতো নারী নির্যাতন মামলা করবে। আমাদের অন্ধ আইন তখন আসামি নারীদের অর্থাৎ মা–বোনদের নারী হিসেবে বিবেচনা করবে না। তখন বাদীই শুধু নারী।

তারপর দুইবার আমার সন্তানকে দেখতে গিয়েছিলাম। চরম অপমান করেছে তারা। তিন মাস অপেক্ষা করে চলে এলাম এক মুহূর্তের জন্য নিজের সন্তানকে ভুলতে পারি না। মাঝে মধ্যে কল্পনায় তার সঙ্গে কথা বলি। পরিচিত লোকজন দেশে গেলে তাদের সঙ্গে মেয়ের জন্য কাপড়, চকলেট পাঠাই আর অনুভব করতে চেষ্টা করি বাবার দেয়া জিনিস পেয়ে সে কতোটুকু খুশি হলো।

গত সপ্তাহে বাসা পরিবর্তন করতে গিয়ে জিনিসপত্র গোছানোর সময় সেই অভিশপ্ত শাড়িটি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম, আর ভাবলাম জীবনের সব কষ্ট–গ্লানিগুলো যদি এভাবে ফেলে দেয়া যেতো!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ইটালি থেকে

আশ্রয়

– মোস্তফা সারোয়ার

সকালে নাশতা সেরে বাসা থেকে বের হয়েছি কর্মস্থলের উদ্দেশে। বাসস্ট্যান্ড এসে দাড়িয়েছি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বাসের কোনো সন্ধান পেলাম না। অবশেষে বাধ্য হয়ে রিকশা নিলাম। রিকশা চলতে চলতে টিকাটুলি এসে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লো। এরই মধ্যে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। দেখলাম, একজন মা তার শিশু সন্তানসহ রাস্তা পার হচ্ছেন। বৃষ্টি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মা তার সন্তানকে শাড়ির আচলের নিচে নিয়ে নিয়েছেন। যদিও বৃষ্টি তখন খুব জোরে শুরু হয়ে গেছে। মা তার বাচ্চাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারছেন না। কিন্তু তার বাচ্চাটি এমনভাবে আচলের পাশ দিয়ে তাকিয়ে আছে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সে বসে আছে।

মাতুয়াইল, ঢাকা থেকে

ইটালিয়ান

– এসএম জাকির হোসেন

আমি যেখানে থাকি তার প্রায় দুইশ মিটার দূরে একটি বার রয়েছে। প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে এখানে কফি পান করি এই সূত্রে বারের বৃদ্ধ মালিকের সঙ্গে বেশ চেনাজানা হয়ে যায়। দেখা হলে আমি এবং তিনি নিজেদের মাঝে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করি।

একদিন সে আমাকে বলেন আমি তোমাকে একটি ইনডিয়ান জিনিস দেখাবো যা আমার স্ত্রী ইনডিয়ায় গিয়ে নিয়ে এসেছিল।

আমি বেশ আগ্রহ দেখানোতে তিনি সময় করে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তার বাসায় যা দেখলাম তা দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। পচিশ বছর আগে তার স্ত্রী ইনডিয়ায় গিয়েছিলেন বেড়াতে। সেখান থেকে একটি হাতের কাজ করা সুন্দর শাড়ি নিয়ে আসেন। তার স্ত্রী দশ বছর আগে মারা গেছেন। তার স্ত্রী শাড়িটি ড্রয়িং রুমে শেলফে সাজিয়ে রেখেছিলেন। এই দশ বছর সেটায় কোনো হাত পড়েনি।

আমাকে দেখে তিনি শাড়িটা বের করে দেখালেন। তার স্ত্রী নাকি আমাদের দেশেও গিয়েছিলেন। এখানে নাকি শাড়ি পরিহিত মেয়ে দেখে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। শাড়ি পরিহিত অনেকের ছবিও তিনি উঠিয়ে এনেছিলেন। অনেককে এসব ছবি দেখিয়ে বলতেন নিজের অভিজ্ঞতা। একটি বিয়ের শাড়ি পরিহিত ছবিও দেখলাম তার এলবামে। সুদূর ইটালিতে এমন অভিজ্ঞতা আমার হবে ভাবতেই পারি না।

এখানে আমার এক ইটালিয়ান বন্ধু আমাকে বলেছেন, তার মতে শাড়ি নাকি রহস্যময় পোশাক। এতো লম্বা পোশাক কি করে পরে এটা নাকি সবচেয়ে বড় রহস্য। তার মতে, এতো বড় কাপড়। তাই দামও নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে।

এক মেয়ে বান্ধবী আমাকে বলেছে, তোমাদের মেয়েরা শাড়ি পরে কিভাবে হাটা চলা করে? একটা কাপড় এভাবে সারা গায়ে জড়িয়ে রাখার দরকারই বা কি সেটা তার মাথায়ই নাকি ধরে না।

যাক, শাড়ি নিয়ে এদের যথেষ্ট উৎসাহ যে রয়েছে তা আর একটি ঘটনা বললেই বোঝা যাবে।

এই ছোট শহরে গত এক বছর যাবত অনিকেত নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এদের প্রথম অনুষ্ঠানে একটি মডেলিং পর্ব রয়েছে যাতে দেশীয় পোশাক পরবে ইটালিয়ানরা। যেমন করেই হোক তারা ইটালিয়ান মেয়ে যোগাড় করলো। কথাটা বাতাসের মতো ছড়ালো।

প্রচুর ইটালিয়ান অনুষ্ঠানের দিন হাজির ক্যামেরা নিয়ে। হল ভর্তি দর্শক। আমাদের কিছু ভাবীর সহায়তায় ইটালিয়ান মেয়েরা শাড়ি পড়ে যখন স্টেজে এলো তখন কি বলবো আমরা বসে তালি দিচ্ছিলাম। কিন্তু অতি উৎসাহী ইটালিয়ানরা তালি দিতে দিতে সবাই দাড়িয়ে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি ইটালিয়ানদের লম্বা গড়নের দেহে শাড়ি চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল। মুহুর্মুহু ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর থামেই না। এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য সংগঠনটিকে ধন্যবাদ জানাতে কেউ কার্পণ্য করেনি।

কিন্তু তখনি দুঃখ লাগে যখন এখানে এসে বঙ্গললনারা বলেন, শাড়ি পরতে ভালো লাগে না। অনেকে বলেন, ইটালিয়ানরা কেমন করে তাকিয়ে থাকে এ জন্য অস্বস্তি হয়। অনেকে বলেন, ভালো করে শাড়ি পরতে পারি না, তাই পরা হয় না। আবার এখানে যখন বৈশাখী মেলা হয় তখন যে যেমন পারেন শাড়ি যোগাড় করে হলেও পরে আসেন। প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নেন। তখন মনে হয়, শাড়ি পরলে যে, বঙ্গ নারীকে কতোটা সুন্দর লাগে তা আপনাদের অনেকেই হয়তো জানেন না।

ইটালি থেকে

পিকনিক

– ইসমত জাহান বীনা

তখন ক্লাস টেন–এ পড়ি। আমার বাবা বগুড়ায় চাকরি করতেন। তাই আমরা সপরিবারে থাকতাম বগুড়ায়। আর আমি পড়তাম ভিএম স্কুলে। এর আসল নাম বগুড়া গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল। সে বছর টেস্ট পরীক্ষার পর আমাদের স্কুল থেকে মর্নিং শিফট ও ডে শিফট মিলে পাহাড়পুরে পিকনিক করার সিদ্ধান্ত হলো।

স্বভাবতই আমরা সব বান্ধবীরা খুব সাজগোজ করলাম। সবাই মিলে ঠিক করলাম, আমরা শাড়ি পরে পিকনিকে যাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমরা মাত্র তিনজন শাড়ি পরেছি। শাড়ি পরে ঠিকমতো হাটতে পারি না। এরপরও শাড়ি পরার ঝুকিটা নিলাম। অবশ্য এর জন্য আমাকে কম পস্তাতে হয়নি।

নির্দিষ্ট দিনে বাসে করে পাহাড়পুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। এদিকে জেলা স্কুলের কিছু বখাটে ছেলে ভিএম স্কুলের মেয়েরা পিকনিকে যাচ্ছে জেনে যে যার মতো মোটর সাইকেল, জিপ নিয়ে পাহাড়পুরের দিকে রওনা দেয়। পাহাড়পুর পৌছার পর আমরা সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ছবি তোলার আগে সবাই যে যার মতো চুল ঠিক করছিলাম। হয়তো বা শাড়ি ঠিক করছিলাম কিংবা সাজটা ঠিক আছে কি না তা আয়নায় দেখছিলাম।

এদিকে বখাটে ছেলেগুলো যেন আমাদের পেয়ে বসলো। তারা খুব আজে বাজে মন্তব্য করছিল। যেমন *এতো সেজে কি হবে।* এ সময় *চোলি কা পিছে ক্যায়া হ্যায়* আর *সেক্সি সেক্সি* গান দুটি খুব চলছিল। এবং তারা এই গানগুলো বেশ আয়েস করেই আমাদের উদ্দেশে গাইছিল। স্যার, ম্যাডামরাও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কোনো অঘটন না ঘটে যায় শেষে।

স্যাররা ছেলেগুলোকে বকা দিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে তারা বেশ অনুনয় করে ছেলেগুলোকে বললেন, তোমরা এ রকম করছো কেন? তারা তো তোমাদের ছোটবোন হয়, আপু হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলো বলে উঠলো, সবাই যদি বোন হয় তাহলে বৌ হবে কোনগুলো।

আমাদের সবার পিকনিকের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। আমরা মন খারাপ করে ঘুরতে লাগলাম। ছেলেগুলো কিন্তু আমাদের পিছু ছাড়লো না। তারা যে যার মতো সময় বুঝে নিজেদের মন্তব্য করছিল।

একটা ঢালু জায়গায় এসে শাড়ির সঙ্গে পা লেগে হঠাৎ করে আমি পড়ে যেতে লাগলাম। পাশের বান্ধবীকে ধরে কোনো রকমে নিজের পতন ঠেকালাম।

নিজেকে সামলে নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কেউ আমাকে দেখেছে কি না। কিন্তু একটু দূরে কয়েকটা ছেলে দৃশ্যটা বেশ উপভোগ করছিল। এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, ইশ! পড়ে গেলে আমি ধরে ফেলতাম।

কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। ছেলেগুলো হয়তো আরো কিছু বলতো। কিন্তু তার আগেই আমার বান্ধবী আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো। তাতে কি, ছেলেগুলো আমাকে দেখলেই এক সঙ্গে বলে উঠতো, ইশ! পড়ে গেলে ধরে ফেলতাম।

এদিকে স্যাররাও প্রচণ্ড বিরক্ত। এতোগুলো মেয়েকে নিয়ে তারা ভীষণ বিপদে পড়েছেন। এ রকম একটা পরিস্থিতি হবে তারা ভাবতেও পারেননি। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা বাসে উঠে পড়লাম। যথারীতি রাজপুত্ররা বাসের ছাদে উঠে পড়লো। স্যাররা কোনো ভাবেই তাদের ছাদ থেকে নামাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাদের কিছু বলতে না পেরে স্যাররা আমাদেরকেই বকছিলেন।

আমাকে এক সময় এক স্যার বলেই ফেললেন, শাড়ি পরে হাটতে পারো না, শাড়ি পরতে গেলে কেন?

চুপ করে রইলাম। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। সবার সামনে এভাবে বলাতে লজ্জায়, অপমানে এতোটুকু হয়ে গেলাম।

আমরা বিকাল পাচটার দিকে বগুড়ায় ফিরে এলাম। এরপর আমাদের স্কুল থেকে বাইরে পিকনিকে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর আমাকে মধ্যে মাঝেই শুনতে হতো, *ইশ! পড়ে গেলে ধরে ফেলতাম।* কখনো বা *চোলি কা পিছে ক্যায়া হ্যায়, হাই সেক্সি* এই জাতীয় গান।

এরপর অনেক দিন হয়ে গেল শাড়ি পরে বাইরে যাওয়ার ঝুকিটা কখনো নিইনি। অবশ্য শাড়ি পরে ছবি তুলেছি। ব্যস, এ পর্যন্তই। কিন্তু শাড়ি পরে কখনো বাইরে বের হই না।

রাজশাহী মেডিকাল কলেজ থেকে

মায়ের মতো

– মোহাম্মদ শওকত হাসনাত

ভাগ্য অন্বেষণে দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রবাসে পড়ে আছি। একটু অবসরেই মনে পড়ে ফেলে আসা স্বজনদের কথা, হতভাগ্য দেশের কথা। সে যে কি কষ্ট বলে বোঝানো যাবে না। নিয়ত কষ্টের জীবন এক সময় সহ্য হয়ে যায়। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। যাপিত জীবন সুখের, নাকি দুঃখের এ আত্মজিজ্ঞাসা আগের মতো আর বিভ্রান্ত করে না। তবুও অন্যের জীবন বোধ বেশ–ভূষা, হাসি–আনন্দ মাঝে মধ্যে স্তম্ভিত করে দেয়। তেমনি এক ঘটনায় একদিন ক্ষণিকের জন্য আনমনা না হয়ে পারিনি। সেদিন ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। রবিবারে মাঝে মধ্যে কাজ থাকে, নয়তো প্রতি রবিবারই ছুটি। অবশ্য ছুটির দিনে কাজই সকল প্রবাসীর আরাধ্য। কারণ কাজ করতে পারলে দুই এক ডলার আসার সম্ভাবনা থাকে, নয়তো বসে থাকলে উল্টো দুই চার ডলার জল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সারা সপ্তাহ কাজ করে ছুটির দিন ঘরে বসে থাকা সবার জন্যই কষ্টকর। সিঙ্গাপুরের মতো মোহনীয় দেশ হলে তো কথাই নেই।

আমি আর বন্ধু স্বপ্নীল বিকাল তিনটায় বের হলাম মেরিনা স্কয়ারের উদ্দেশে। প্ল্যান ছিল কিছু সময় মেরিনা স্কয়ারে ঘুরবো, শপিং মলে কিছুক্ষণ হেটে বেড়াবো। যাকে আমরা বলি আই (Eye) শপিং অর্থাৎ ডলারে শপিং যেহেতু অসাধ্য, সেহেতু শুধু চোখ দিয়েই শপিং করবো।

যাক, ঘণ্টা দুয়েক বেড়ানোর পর আমরা চলে এলাম সমুদ্র সৈকতে। পড়ন্ত বিকেলের ঢেউ ভাঙা বাতাস আর বহু মানুষ নানান রকম সাজে মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাজার হাজার নানান বয়সের নরনারীর মেলা। নারীদের সাজ পোশাক ছিল বিচিত্র। শাড়ি থেকে শুরু করে বিকিনি পর্যন্ত। অন্যের দিকে তাকানোর সময় কারো নেই। সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের জনপদে সে এক অকল্পনীয় ব্যাপার। অনেক দূর হাটার পর একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে আমরা বসে পড়লাম। কিছুদূর পর পরই সৈকতে বসার জন্য পরিচ্ছন্ন বেঞ্চ পাতা আছে। সূর্য অস্তের মুহূর্ত, কিছুটা আলো–আধারি, এদিকে পার্কের নিয়ন লাইটের আলো আস্তে আস্তে দিনের আলোকে পরাজিত করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। আমরা দুইজন কথা বলছি। হঠাৎ একটু দূরের বেঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই যেন বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার মায়ের বয়সী এক ভদ্রমহিলা একা বসে আছেন, পরনে শাড়ি। আচল মাথার ওপর। আমার যেন দৃষ্টি ভ্রম হলো। মনে হলো আমার মমতাময়ী মা বসে আছেন। অনেকটা এ রকম যেন আমাদের সঙ্গেই এসেছেন। দুই বন্ধুকে এখানে রেখে একটু দূরে গিয়ে বসেছেন। অদ্ভুত ভালোলাগায় আনমনা হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। আমি যেন সেখানে থেকেও নেই। নিমেষেই চলে গেছি আমার মায়ের কাছে। হঠাৎ স্বপ্নীলের ধাক্কায় সংবিৎ ফিরে পেলাম। তাকে বললাম, আমার দৃষ্টি ভ্রমের কথা।

স্বপ্নীল বললো, আমি নিশ্চিত ভদ্রমহিলা বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন। আপনি বসুন আমি কথা বলে আসি। কাছে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে সে জানতে চাইলো, আপনি কি বেড়াতে এসেছেন বাংলাদেশ থেকে। আপনার সঙ্গে কি অন্য কেউ নেই। কোথায় উঠেছেন।

আমি অপলক তাকিয়ে রইলাম ভদ্রমহিলার দিকে। মায়ের মমতা মাখা হাসি দিয়ে স্বপ্নীলের কথার উত্তরে ইংরেজিতে বললেন, দুঃখিত, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি ইংরেজিতে বলো। তারপর বললেন, আমি ইনডিয়ার তামিলনাড়ু থেকে আমার ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছি।

স্বপ্নীল হতাশ হয়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমার কাছে ফিরে এলো। শুধু শাড়ির জন্যই সেদিন আমার জননীকে এতো গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম। সেদিন যদি ভদ্রমহিলার পরনে শাড়ি না থাকতো তাহলে নিশ্চয় সে সুন্দর মুহূর্তে এভাবে মাকে মনে পড়তো না। সেদিন আর কিছুই ভালো লাগেনি। ফেরার পথে শুধু মায়ের কথাই ভেবেছি। এবং মনে মনে বলেছি, মা, তুমি এ মুহূর্তে কেমন আছো জানি না। যেভাবেই থাকো ভালো থেকো। যতোদিন বেচে থাকবো প্রবাসের এ সুখ স্মৃতি আমার মনে থাকবে।

সিঙ্গাপুর থেকে

শাড়ি নয় স্বামী

ওগো হরিণী চোখের মনোহারিণী... আমাকে দেখে কলেজে ছেলেরা গান জুড়ে দিতো। পাত্তা না দেয়ার দরুন নাম পেলাম দেমাগী, অহঙ্কারী।

একদিন এক ছেলে হঠাৎ বললো, তুমি শুধু সুন্দরীই নও, তোমার কথাগুলোও অনুরাগের ছোয়া...।

কলেজে ফাংশন দেখছি। হঠাৎ মাইকে গান গাইতে আমার নাম ডাকা শুনে ঘামতে শুরু করি। বুঝলাম আমাকে জব্দ করার জন্য ছেলেরা এটা ঘটিয়েছে। রাগে ও বুকে ভয় নিয়ে স্টেজে উঠে গান ধরলাম, *এনেছি আমার শত জনমের প্রেম...*।

গানের শেষে হাতে তালি ও চতুর্দিক থেকে চিৎকার, ওয়ান মোর, ওয়ান মোর।

হঠাৎ পাত্রপক্ষ দেখে পছন্দ করে কলমা পড়ে ফেললো। সুন্দরী হবার দোষে এটা ঘটলো।

কিছুদিন পর ইউনিভার্সিটির হলে গিয়েছি বেড়াতে। কিন্তু পরদিন বিকেলেই দেখি, হলের সামনে আমার স্বামী উপস্থিত। বললো, চলো, তোমাকে আমার ভাই-ভাবী দেখতে চেয়েছে।

এখনো অনুষ্ঠান করে আমাকে উঠিয়ে নেওনি, তার উপর শাড়ি আনিনি। কিভাবে যাবো?

তার চাপে বাধ্য হলাম যেতে। বাড়িতে গিয়ে বেশ অনেকক্ষণ পর বুঝলাম ভাই-ভাবী কেউই নেই। তাদের দুটো ছেলে আছে বাসায়। নতুন বৌ সুবাদে চায়নিজ খাওয়া হলো। শেষে রাত বারোটার দিকে বেডরুমে যেতেই হুশ হলো শাড়ি তো পরা নেই, নাইটিও নেই। কিন্তু এতো রাতে কিছুই সম্ভব হলো না। কিছুক্ষণ পর স্বামী আমার ওড়না ফেলে জামা খুলতেই বললাম, লাইট অফ করো।

আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। স্বামী আমার সম্পূর্ণ কাপড় খুলে খাটের পাশে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নায় লাইটের ঝাঝালো আলোতে সারা রাত...।

ভোরে আমাকে জড়িয়ে চুমু দিয়ে স্বামী বললো, রেস্ট নাও। মন খারাপ করো না। তোমার জন্য পাকিস্তান থেকে নীল বেনারসি, ইনডিয়ান গোল্ডেন এবং বাংলাদেশি লাল-খয়েরি বেনারসি কিনেছি। কোনটা পরবে অনুষ্ঠানে?

আমি লাইট ও আয়নার কাচ দেখে লজ্জায় ভাবতে লাগলাম এই মুহূর্তে যদি একটা সুতি শাড়ি পেতাম তো নিজের শরীরটাকে ঢাকতে পারতাম।

এখন আমার প্রচুর শাড়ি। সবাই বলে আমি শাড়িপাগল। কিন্তু স্বামী আমার প্রবাসী তাই আজ একলা বিছানায় যখন অস্থির হয়ে উঠি তখন শাড়ি খুলে ছুড়ে ফেলে দিতে মন চায়। বলতে ইচ্ছে হয় শাড়ি নয়, স্বামী চাই... প্রবাসীর বৌ হওয়া আর আলমারি ভর্তি শাড়ির এতো কষ্ট তা আগে বুঝলে প্রবাসী শুনলেই জাহান্নামের আগুন ভেবে দৌড় দিতাম।

এখন মনে হয়, স্বামীই যদি পরনের শাড়ি হতো তো কখনোই খুলতাম না...।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রামচন্দ্রপুর, পাবনা থেকে

বেদনা

– মালা

আমি এমন একজন দুর্ভাগা মহিলা যে সারা জীবনে স্বামী, শ্বশুর, দেবরদের কাছ থেকে সামান্য উপহার হিসেবে একটি শাড়িও পেলাম না। শুধু বিয়ের সময় স্বামীর দেয়া একমাত্র শাড়ি ছাড়া।

পৃথিবীতে এমন অনেক না বলা কথা থেকে যায় যা কাউকে বলা যায় না। লেখাটি ছাপা না হলে হয়তো বা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমার বেদনাটুকু অজানা থেকে যাবে। কারণ স্বামী হচ্ছে স্ত্রীদের মাথার মণি, তাকে তো আর ছোট করা যায় না! ধন্যবাদ।

শরীয়তপুর থেকে

ধ্রুবসত্য

– বিল্লাল হোসেন

জীবনের প্রথম যৌবনের ধাক্কাকে সামাল দিতে পারলেও দ্বিতীয় ধাক্কাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। প্রেম করেছি। বিয়েও করে ফেলেছি ছাত্র থাকা অবস্থায়। ছেলে এবং মেয়ে সংবলিত একটা স্কুলে আমি লেখাপড়া করতাম। ক্লাস নাইনে উঠলে আমার জীবনে প্রেম যেন একান্ত প্রয়োজনীয় একটা বিষয় হিসেবে দেখা দিল। প্রেম করার জন্য আমার মন সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকতো। রাতে ভালো ঘুম হতো না। স্বপ্ন দেখতাম বিভিন্ন মেয়েকে। ক্লাস এইটের একটা মেয়েকে খুব পছন্দ হয়েছিল আমার। ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়েছিল তাকে।

মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি এ কথাটি তার সামনে দাড়িয়ে বলবো এমন সাহস হতো না। বন্ধুদেরকে বললে তারা বলতো, ভয় করলে প্রেম হবে না। সাহস করে বলে ফেল। একদিন টিফিন পিরিয়ডে মেয়েটিকে ডাক দিয়ে তার হাতে একটা চিঠি দিলাম। চিঠিটা দেয়ার পর আমার মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল। বন্ধুরা ডাক দিলেও ভয়ে চমকে উঠতে লাগলাম। এক সময় লাইব্রেরি থেকে আমাকে ডেকে পাঠালো। লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি সেই মেয়েটি হেড স্যারের কাছে দাড়িয়ে আছে। স্যারের হাতে আমার দেয়া সেই চিঠিটা দেখে বুঝতে পারলাম আজ আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। আমাকে এবং

সেই মেয়েকে লাইব্রেরিতে রেখে স্কুল ছুটি দিয়ে দিল। আমার দেয়া চিঠিটা স্যার আমার হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার লেখা?

আমার।

কেন লিখেছো?

স্যারের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না ভয়ে। চিঠি দেয়ার অপরাধে ডাবল বেত দিয়ে প্রেম করার সাধ মিটিয়ে দিলেন স্যার। স্যার আমাকে বললেন, আর যেন এমন কাজ না হয় সাবধান!

সেদিন থেকেই আমার প্রথম যৌবনের ঢেউ থেমে যায়। আমার পৃথিবী থেকে প্রেম পালায়।

অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর আবার ধাক্কা দিল যৌবন। ইচ্ছা হলো প্রেম করতে। প্রেম হয়েও গেল। এ প্রেমের কথা আমাদের পরিবারের সবাই জেনেও গেল। আমার এ প্রেমের কথা দাদি জানার পর আমাকে প্রায় বলতেন, দাদু, এখন প্রেম-ট্রেম করার দরকার নেই। লেখাপড়া শেষ করো, পরে ভালো মেয়ে বিয়ে করতে পারবে।

দাদি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলতেন, এখন তুমি লেখাপড়া করছো। কোনো টাকা-পয়সা আয় করতে পারো না। প্রেম করে বিয়ে করলে তোমার বৌকে শাড়ি, চুরি, স্নো, পাউডার এ সমস্ত কিছু দেবে কিভাবে। লেখাপড়া শেষ করে একটা চাকরি-বাকরি করো। তারপর বিয়ে করো। প্রেম করার দরকার নেই।

প্রেমিকার প্রতি এতো বেশি মগ্ন ছিলাম যে, দাদির কোনো কথাই আমার কাছে কথা বলে মনে হতো না। মনে হতো আবোল-তাবোল বকছেন। দাদির সমস্ত কথাকে অমান্য করে সবার অজান্তে গোপনে বিয়ে করে ফেললাম। এক সময় বাড়ির সবাই জেনে গেল আমার বিয়ের কথা। অসম্মতি প্রকাশ করে কোনো লাভ হবে না ভেবে সবাই মেনে নিলো নির্দ্বিধায়। নববধূকে ঘরে তুলে নিল। শুরু হলো আমার দাম্পত্য জীবন ছাত্র অবস্থায়। বিয়ে করার আগে দাদি আমাকে প্রায় বলতেন একটা প্রবাদ বাক্য। দাদি বলতেন –

হাতে নেই পয়সা কড়ি
মনে হয় বিয়ে করি
বৌ-এ চায় রেশমি শাড়ি
মনে কয় লাথি মারি।

দাদির বলা এ প্রবাদ বাক্যটা ধ্রুবসত্য। তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারছি। তখন দাদির মুখে এ কথাগুলো শুনে রাগ হলেও আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি কথাটি ধ্রুবসত্য। বৌ-এর ওপর এখন রাগ হয় যখন সে শাড়ি, চুরি, স্নো, পাউডার চায়। স্ত্রীকে নিয়ে এখন আমার মহা বিপদ। স্ত্রী যখন যা কিছু চায় তখন তা দিতেই হবে আমাকে। দিতে না পারলে কোনো কথা নেই আমার সঙ্গে। আমার স্ত্রী এমন যে, সে যেটা চাইবে সেটাই দিতে হবে – একটু এদিক-ওদিক হলে চলবে না। বিয়ের আগে আমি কখনো বুঝতে পারিনি যে, আমার প্রিয়ার বৈশিষ্ট এমন। ঈদ এলে পরিবারের সবার জন্য নতুন কাপড় কিনতে হয়। কাপড় কেনার দায়িত্বটা আমার ওপর পড়ে। কেনাকাটার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে জানার পর আমার স্ত্রী জেদ ধরে সে আমার সঙ্গে যাবে। তাকে না করতে পারলাম না। স্ত্রীকে

নিয়ে ঈদের বাজার করতে গিয়ে পড়লাম মহা বিপদে। অন্য সবার সমস্ত কাপড় কেনার পালা শেষ। এবার আমার স্ত্রীর পালা। আমার স্ত্রীর জন্য বাজেটে যে পরিমাণ টাকা ছিল তা তার রুচিসম্মত কাপড়ের দামের তুকাপড় পছন্দ করতে লাগলো। যার প্রতিটার মূল্য বাজেটকৃত টাকার থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। তাকে একটু কম দামের কাপড় পছন্দ করতে বললে দোকানের ভেতর থেকেই সবার সামনে বলে ফেললো, তাহলে আর প্রেম করতে গিয়েছিল কেন?

লজ্জায় আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। সে চূড়ান্তভাবে একটা শাড়ি পছন্দ করে ফেললো যার দাম আমার সামর্থের বাইরে ছিল। এটা নয়, কম দামের একটা পছন্দ করো, এমন কথা বলতে আর সাহস হলো না আমার। আবার কি বলে ফেলবে! শাড়ির দাম দেয়ার আগেই ব্যাগে করে শাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

লজ্জায় আমার ঘাড় ঘুরছিল না। আমি দোকানে থাকা অবস্থায়ই আমার স্ত্রী বেশ দূরে চলে গেল। আমার কাছে যে টাকা ছিল তা দোকানদারকে দেয়ার পর জিজ্ঞাসা করলো, আর কই?

কোনো উপায় না পেয়ে হাতের ঘড়িটা খুলে দিয়ে বললাম, বাকি টাকা দিয়ে ঘড়িটা নিয়ে যাবো।

আজ পর্যন্ত আমার সেই ঘড়িটা আনতে যাইনি লজ্জায়। এখন আমি বুঝতে পারি ছাত্র থাকা অবস্থায় প্রেম করে বিয়ে করার আনন্দ কতো সুখের হয়। এখন আমি বুঝতে পারি দাদির বলা সেই কথাটি কতো সত্য।

মাগুরা থেকে

পরম চাওয়া

– অনিতা পারভীন

আমার মা পঞ্চাশোর্ধ এক অতি সাধারণ মহিলা। বদমেজাজি বাবার কারণে মায়ের সংসারে অনেক কিছুই অনুপস্থিত! এর মধ্যে ভালো কোনো শাড়ি একটি। একটা ভালো শাড়ি না থাকাটা কোনো সমস্যা নয় অন্তত আমার মা এটা মনে করেন। আমিও হয়তো এটাই মনে করতাম যদি আমার জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি ঘটনা না ঘটতো।

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। পাড়াতো বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। সেদিন আমার জীবনে সর্বপ্রথম শাড়ি পড়ার সুযোগ হয়। কিন্তু বিধি বাম। ছোট বলে কেউ আমাকে একটা শাড়ি ধার দেয়নি।এবং অনুষ্ঠানটি যখন ভিডিও করা হচ্ছিল আমাকে তখন ঠেলে বের করে দেয়া হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ম্যাচ করবে না বলে। পরে যখন ক্যাসেটটি টিভিতে দেখেছি তখন নিজেকে দেখতে না পেরে কান্না চেপে রাখতে পারিনি।

ক্লাস টেনে পড়ি। তখন বড় ভাইবোনদের বিদায় অনুষ্ঠান। আমরা ছোটরা স্যারদের সঙ্গে মিলে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আগে থেকে কথা ছিল সবাই শাড়ি পরবো। আমার যেহেতু শাড়ি নেই সেহেতু আমার মতো একজনের খোজ করলাম যে শাড়ি পরবে না। পেয়েও গেলাম কয়েকজনকে। কথা মতো স্কুলে এসে দেখি আমাদের ক্লাসের সব মেয়েরা শাড়ি পরে হাসাহাসি করছে, সঙ্গে শাড়ি

পড়বে না কথা দেয়া মেয়েগুলোও। তাদের এতো চমৎকার লাগছিল! নিজেকে সেখানে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল। অগত্যা নিজেকে আড়াল করার জন্য বাড়ি চলে এসেছিলাম।

কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবীনদের ফুল দেয়ার জন্য আমাদের ক্লাস থেকে স্যার আমাকে ও অন্য দুটি মেয়েকে নির্বাচন করলেন। পরের দিন অনুষ্ঠান। কথা মতো অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সব মেয়েরা স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি শাড়ি না পরার কারণে স্যার রেগে গেলেন। এমনিতেই স্যার ছিলেন রগচটা। আমার শাড়ি না থাকার ব্যাপারটি বলতেই স্যার বললেন, আগে বলোনি কেন?

এরপর খস খস করে লিস্ট থেকে আমার নামটি কেটে দিলেন। অথচ সেদিন আমি আমার সবচেয়ে ভালো ড্রেসটি পরে গিয়েছিলাম। মনে আছে সে ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কলেজে যাইনি। লজ্জায় কোনো বন্ধুদের সামনে দাড়াতে পারিনি।

এবার আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। পাস করার পরে মা যদি কিছু দিতে চায় তাহলে বলবো, শাড়ি দিও। আমি আর কিছুই চাই না, শুধু একটা শাড়ি।

বিক্রমপুর থেকে

চোখের জল

– সা'দত

তার জন্য এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। কিন্তু সে আসছে না। ধৈর্যের বাধ ভেঙে যাচ্ছে। অবশেষে এলো সে। পরনে লাল শাড়ি। অপরূপ লাগছে তাকে। এই প্রথম তাকে শাড়িতে দেখলাম। সেও বোধহয় প্রথমবারের মতো শাড়ি পরেছে। অনভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রাণপণে চেষ্টা করছে শাড়িটা শরীরে ঠিক রাখতে। মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছি। নীরবতা ভাঙলো সেই।

কি দেখছো এমন করে?

তোমাকে। শাড়িতে তোমাকে চমৎকার মানায়, মেয়েদের শাড়ি না পরলে ভালো লাগে বুঝি?

চমৎকার না ছাই। দেখো কেমন অসহ্য লাগছে আমার।

তবুও আমার সামনে এলে শাড়িই পরে তুমি আসবে।

সেও হাসি মুখে সম্মতি জানালো।

বিদায় নিলাম তার কাছ থেকে। দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল চমৎকার। হঠাৎ পিয়ন এসে তার চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি খুললাম ভেতরে লেখা – *যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এসো সামনাসামনি সব বলবো।*

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। দেরি না করে পরদিনই রওনা দিলাম তাদের ওখানে।

সে এলো! কথা অনুযায়ী শাড়ি পরেনি আজ। মুখটাও কেমন যেন শুকিয়ে গেছে তাতে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম তার এই অবস্থার কারণ । সে যা বললো তার অর্থ হচ্ছে, তার বাবা–মা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তার বিয়ে। আমি যেন কিছু একটা করি। কথাটা শোনার পর একদমই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বলে মনে হলো আমার কাছে। কারণ তখন আমাদের দুজনের বয়সই অল্প। তাকে আমি হারাতে চাই না। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর

বিনিময়েও না। সে আমার কাছে পার্থিব সব কিছু থেকে বেশি। তাকে হারাতে হবে এটা শুনেই আমার বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। আমার নীরবতা তাকে অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু আমার যে কিছুই করার নেই আমি পারছি না। আমার মনের মতো কোনো সিদ্ধান্ত দিতে। কেননা আমিও যে পরনির্ভরশীল। আর বয়সও যে অল্প। সে চলে গেল ভাঙা মন নিয়ে। ধিক্কার দিয়ে গেল আমার পুরুষত্বের, অপমান করে গেল আমার ভালোবাসার।

বন্ধুত্বের সুবাদে আমারও হলুদের দাওয়াত পড়লো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হলো আমাকে, পাছে কোনো কথা উঠে সেই ভয়ে। শাড়ি পরে আছে সে। বরাবরই শাড়ি পরিহিতা তাকে কল্পনা করতাম ভালো লাগতো কল্পনা করতে। আজ সে বাস্তবে হলুদ শাড়ি পরে আছে। কিন্তু আমার জন্য নয়, চিরদিনের মতো আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য।

খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার সেখানে থাকতে। বাইরে চলে এলাম সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর তার বান্ধবী মারফত খবর পাঠালো সেখানে যাবার জন্য। গিয়ে দেখি সে একা বসে আছে। আশপাশে কেউ নেই।

মুখোমুখি বসে আছি আমরা দুজন শেষবারের মতো।

দেখো তো আমাকে কেমন লাগছে?

ভালো, খুব সাধারণ উত্তর দিলাম।

ভালো তো অবশ্যই! আমার বিয়ে না? বিয়ের সময় কাউকে খারাপ লাগে নাকি, বিয়েতে থাকছো তো? উপহার দিলে নীল রঙের শাড়ি আনবে উপহার হিসেবে, গাঢ় নীল!

তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে কাদছে। প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল দুই হাতে তার চোখের অশ্রু মুছে দিই। কিন্তু পারলাম না। কারণ সে অধিকার নেই আমার।

চলে এলাম তাদের ওখান থেকে জরুরি কাজের কথা বলে। বিয়েতে যেতে পারিনি। ইচ্ছে করেই যাইনি। কিন্তু তার দাবি মতো নীল শাড়ি ঠিকই উপহার দিয়েছিলাম। কারণ নীল যে আমার প্রিয় রঙ! তাছাড়া তারও দাবি।

বেশ কিছুদিন পর আবার তার চিঠি পেলাম। তাতে লেখা :

তোমার কাছে এই আমার শেষ চিঠি। আর কোনোদিন লেখা হবে না। বিয়েতে আসোনি, ভালো করেছো। কারণ তোমাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। যাক সে কথা। একটা ছবি পাঠালাম। আমাকে তোমার কাছে তুমি ধরে রাখতে চেয়েছিলে। কিন্তু তাতো পারোনি! তাই ছবি পাঠালাম। সেটাকে না হয় সঙ্গে রেখো।

নাম লেখা নেই তবুও বুঝলাম তারই চিঠি। ছবিটা হাতে নিলাম। নীল শাড়ি পরে সে দাড়িয়ে আছে যে শাড়িটা আমি তাকে দিয়েছি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে অশ্রুর সন্ধান করলাম। কিন্তু পেলাম না। পেলাম শুধু একরাশ ক্ষোভের সন্ধান।

কুমিল্লা থেকে

ধার

–আক্তার হোসেন

আমি আর কানিজ ১৯৯৫ সালের ৪ মার্চ পালিয়ে যাই। ৯ মার্চ বিয়ে করি। এরপর দুই ফ্যামিলির মধ্যে বাকযুদ্ধ। কানিজের ফ্যামিলি থেকে মাস্তান ভাড়া করা, ভয় ও হুমকি দেয়া, পাড়ার মুরুরি দিয়ে বিচার। কানিজের ফ্যামিলি সঙ্গে কানিজের সম্পর্ক ছিন্ন। আমাদের ফ্যামিলিতে মেনে নেয়া হয়েছিল। এর কারণ হলো ২০ মে আমার এসএসসি পরীক্ষা শুরু। সবার আশা পরীক্ষা যাতে ভালোভাবে দিই।

পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাকে ভালো করতে হবে। তা না হলে সব দোষ চাপবে কানিজের ওপর। তাই সব কিছু ভুলে পড়াশোনায় মনোযোগী হই। পরীক্ষা শেষ, হাতে প্রচুর অবসর।

বন্ধুরা বললো, এবার কানিজকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আয়।

বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করলাম কানিজকে নিয়ে ঘুরতে যাবো বলে।

এক বিকেলে কানিজকে বললাম, চলো, বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। এই কথা শুনে কানিজ খুব খুশি হলো।

বললাম, যাও তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে এসো। আর তখনি দেখতে পেলাম কানিজের চেহারায় মলিনতা। আকাশের সব কালো মেঘ কানিজের চাদ মুখে। কারণ জানতে চাইলে কানিজ বললো তার কোনো ভালো ড্রেস নেই। এমনকি ভালো শাড়িও নেই। আসলেও তাই। পালিয়ে আসার সময় তাদের বাসা থেকে যে দুইটি ড্রেস নিয়ে এসেছিল আর বিয়ের পর আমাদের বাসা থেকে একটি মাত্র কাপড় যা সব সময় বাড়িতে পড়ার জন্য মানে সুতি শাড়ি।

আমার মনটা আনচান করে উঠলো। শাড়ি কিনে দেয়ার মতো ক্ষমতা তো আমার নেই। এবং যেভাবে আমরা বিয়ে করেছি তাতে বাসায় বলতে পারবো না ভালো শাড়ি কিনে দেয়ার কথা। মেজভাবীর কাছ থেকে শাড়ি ধার এবং সেজভাবীর কাছ থেকে ম্যাচিং করা ব্লাউজ। এই প্রথম কানিজ শাড়ি পড়লো। কানিজ যখন তৈরি হয়ে এলো তখন হাসবো, না কাদবো তা বুঝতে পারছি না।

ব্লাউজ হাতের দিকে ঢোলা, নিচের দিকে পেটিকোট বের হয়ে থাকা। এরপরও কেন জানি কানিজকে খুব ভালো লাগছিল। খুব সুন্দর লাগছিল। সদ্য কিশোরী মেয়েরা যখন মায়ের শাড়ি ধরে পড়ে তখন তাদের যেমন দেখায় তেমনি কানিজকে সেই মুহূর্তে সেই রকম লাগছিল।

লাজুক লাজুক ভাব। আমি বড় হয়ে গিয়েছি এমন অনুভূতি। বাইরে ঘুরতে গিয়ে নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম যেন আমরা অনেক বড় হয়ে গিয়েছি। শাড়িটি ছিল পিচ্ছল ধরনের। তাই শাড়ি সামলাতে কানিজের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা কানিজ করতে পারলো না।

বাসায় ফেরার সময় রিকশার চাকায় শাড়ির আচল পেছিয়ে আচল ছিড়ে গেল। আমরা খুব ভয় পেলাম ভাবী না জানি কি বলে। বাইরে ঘোরার সাধ আমাদের মিটে গেছে। প্রায় এক হাতের মতো কেটে আচলের ছেড়া অংশটুকু ফেলে দিতে হলো। শাড়ি এক হাত ছোট হয়ে গেল।

শাড়ির বর্তমান অবস্থা দেখে ভাবী সবাইকে বললেন, ভালো হলো, আমি বেটে মানুষ, এবার শাড়ি আমার মাপ মতো হবে।

সেই শাড়িটি আজো মেজভাবীর কাছে আছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমাদের বিয়ের সাত বছর শেষ হলেও আজো কানিজকে একটি শাড়িও উপহার দিইনি।

সউদি আরব থেকে

জবা

– মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ

তখন ক্লাস টেনের ছাত্র ছিলাম। সবে শীত চলে গিয়ে একটু গরম পড়তে শুরু করেছে। হঠাৎ এক সকালে জ্বর জ্বর মনে হলো। ভাবলাম প্রকৃতির হাওয়া বদলে যাওয়ায় শরীর একটু খারাপ করেছে। কিন্তু বেলা যতোই বাড়তে লাগলো ততোই জ্বরের মাত্রাও বাড়ছে।

ছোটভাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আব্বা–মা গেছেন কয়েকদিনের জন্য। বাসায় একা আমি। তিনটা বেজে গেছে, কাজের মেয়েটি তখনো আসেনি। রোদ মরে আসছে। সব কিছু কেমন বিষিয়ে উঠছে। সিড়িতে হঠাৎ পায়ের শব্দ। পরক্ষণেই ঘরে এলো জবা। পাশের বাসার নীরেনকাকার মেয়ে জবা। আমার চেয়ে এক বছরের বড় হলেও এক সঙ্গেই বড় হয়েছি। বছর দেড়েক আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে বাবার বাসায় চলে এসেছে এক মাস আগে।

জবার পরনে হলদে শাড়ি। আটপৌরে ব্লাউজ। শাড়িটা গ্রামের মেয়েদের মতো উচু করে পরা। কোমর, আচল, চুলের খোপা বেদেনির মতো। আমার দিকে তাকিয়ে মাথার পাশে বসে কপালে হাত রাখলো জবা। আমার মুখের দিকে ঝুকে আছে তার মুখ। মুখটা খুব সুন্দর। ভারী আকর্ষণীয়। জবার টিকালো নাকের ডগায় তিলফুলের মতো ঘাম। বুকের খোলা অংশটা ভেজা। তার হাতটা আমার হাতে টেনে নিলাম।

আমার আঙুলগুলো তার নিজের আঙুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। কি একটু ভেবে বললো, তোমার জন্য এক বাটি দুধ গরম করি।

জবার লকেটটা আমার বুকের কাছে দুলছে। লকেটটায় হাত দিলাম। বড় সুখ। জড়িয়ে ধরলাম জবাকে। ভরাট এক অনুভূতি। এর বেশি শরীরে কুলোবে না।

জবা বললো, অমন করো না। জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে।

জবার আচল খুলে লুটিয়ে পড়েছে আমার বুকে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। আচল তুলে উঠে দাড়ালো জবা।

এই জ্বরে তোমার দুধ খাওয়া ঠিক হবে না, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কতোটা সময় চলে গেল ঠিক মনে নেই। মাথাটা ছিড়ে যাচ্ছে।

জবা ফিরে এলো ডা. মাওলাকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তার আমাকে দেখে প্রেসকৃপশন দিলেন।

দিনের শেষ আলোটুকু সরে গেল। জবা গেছে প্রেসকৃপশন নিয়ে ওষুধ আনতে। আলোটা জ্বালাতে কোনো রকমে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। কিন্তু পা চালাতে পারলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম। কখন যে

কি হলো! অনেকে এসেছেন পাশের বাসা থেকে। তারপর একে একে সব পায়ের শব্দ নেমে গেল সিড়ি দিয়ে। শুধু জবা, ফুলের মতো ঝুকে আছে আমার দিকে। অতি কষ্টে বললাম, তুমি এবার বাড়ি যাও। কিন্তু গেল না।

মধ্যরাত। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। আমার পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে জবা। তন্দ্রা এসেছে বোধহয়। তার ডান হাতটা আমার বুকে। যেন আমার বৌ।

ভোরের দিকে আমার ব্যথার শব্দে জবা জেগে উঠেছে। হঠাৎ জবা চমকে উঠলো। এটা কি? জবা আড়ষ্ট। কি দেখেছে! অতি সন্তর্পণে আমার পিঠের নিচে হাত দিয়ে আমাকে তুলে নিল। তুলে নিয়ে এক পাক ঘুরে যেতেই ভোরের আলোতে চোখে পড়লো, বালিশ আর খাটের সীমানা ঘেষে গলগল করে চলেছে মেটে লাল রঙের একটা সাপ।

আমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে দিয়ে জবা বললো, দেখি এটা গেল কি না।

জবা চলে যাচ্ছিল, আচলটা চেপে ধরে বললাম, আমার ডান হাতের এই জায়গায় দেখো তো।

জবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে কি?

সর্বনাশ! তাহলে তো এর উপরে একটা বাধন দিতে হবে।

বাধনে কি হবে জবা? যেখানে কামড়েছে সেটা মাথার খুব কাছে।

সাপের বিষে শরীরটা এলিয়ে গেল। তার মধ্যে দেখলাম জবা শাড়িটা খুলে ফেললো। জবার শরীরটা কি সুন্দর। বিধাতার সৃষ্টি নারী। একই নারীর কতো রূপ। জবা পেটিকোটের দড়ি খুলছে। একটানে খুলে কোমরের একটু নিচে পেটিকোটটাকে কোনো রকমে গাট দিয়ে সামলে রাখলো। গভীর নাভির নিচে আমার আচ্ছন্ন চোখ চলে গেল। মৃত্যুটা আমার খুবই সুখের হতে চলেছে। আমার হাতে দড়ির ফাস পরাতে লাগলো জবা। জবার দেহের উত্তাপে দড়িটা গরম। মনের কল্পনাও হতে পারে, ব্লাউজে দুটো সেফটিপিন। তারপর অচেতনায় তলিয়ে গেলাম।

কতোদিন চলে গেছে কে জানে? আমার মরা হলো না? চোখ মেলে তাকালাম। সামনেই আব্বা-মা, তাদের পাশেই আনতমুখে জবাসহ আরো অনেকে। আমার জন্য জবা যা করেছে তার প্রতিদান হয় না। জবার মাথায় হাত রেখে বাবা বললেন, এই মেয়েটির কাছে মৃত্যুও হার মেনেছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

মাশুল

প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। তিনি একজন তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী। অথচ তার দুটি বৌ। যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে দুটি বিয়ে, দুই বৌ! তিনি তখন আমার দুই মায়ের জন্য দুটি করে শাড়ি কিনে আনতেন। শাড়ি এনে মায়ের হাতে দিতেন যেহেতু তিনি বড়। মা একটি রেখে অপরটি আমার ছোটমাকে দিতেন। এভাবে মাঝে মধ্যেই দুটি করে শাড়ি আনতেন। অবশ্য বাবার তখন উপরি কিছু আসতো।

এক সময় আমার বাবা তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে সমঝোতার মাধ্যমেই তালাক দিয়ে দেন। যাওয়ার সময় আমার বাবা তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বারোশ টাকা এবং একটি কন্যা সন্তান দিতে পেরেছিলেন। বারোশ

টাকা দিয়েছিলেন মোহরানা হিসেবে। কন্যা সন্তানটির লালন-পালন অবশ্য এখন আমাকেই করতে হচ্ছে। আমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানসহ আমরা ভাইবোন নয়জন। আমরা এখন প্রায় সকলেই বড় হয়েছি। এখন আমার বাবা অবসর নিয়েছেন। সেই সময় আমাদের জন্য পাচটি হাফপ্যান্ট আনলে বেশ কয়েকদিন চলে যেতো। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। এখন আমাদের প্রত্যেকের চাহিদা বেড়েছে, পোশাকের মাপ বেড়েছে। বোনদের শাড়ি পরার মতো বয়স হয়েছে। অথচ আমার বাবার আয় বন্ধ, যিনি মাসে দুটি করে শাড়ি দিতেন সেই তিনি আজ আমার মাকে বছরে একটি নরমাল কাপড় দিতে পারেন না। অপরিকল্পিতভাবে একটি পরিবারকে বড় করেছেন। তার উপর দ্বিতীয় আরেকটি পরিবার গঠন করেছেন।

এখন আমরা বড় হলেও আয় করার মতো সকলের অবস্থা বা পড়ালেখা এখনো শেষ হয়নি। তাই বাবার উত্তরসূরি হিসেবে তার ভুলগুলোর মাশুল আমাদের তিলে তিলে দিতে হচ্ছে। সামাজিকভাবেও আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই যা অতি কষ্টের, অতি দুঃখের। আজ পথহারা নাবিকের মতোই ছুটছি। সমুখে শুধু বিশাল সাগর। জানি না কোন পথে গেলে কূলের সন্ধান পাবো।

সবশেষ যে কথা বলতে চাই, শাড়ি প্রতি মাসেই নয়, একটির জায়গায় দুটি নয়, প্রয়োজনে অতিরিক্ত নয়। যে টাকা আজ সহজে ব্যয় করছেন তা আপনার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, আপনার উত্তরসূরিদের জন্য রাখার চেষ্টা করুন। এতে সমাজটা সুন্দর হবে। দারিদ্র কমবে। সর্বোপরি সকলের জীবনটাই হবে আনন্দ, স্নেহ ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ।

নাম ঠিকানাবিহীন

ফেয়ারি কুইন

– সোমা

আমার মা কালারফুল শাড়ি পরতে খুব পছন্দ করতেন। আর সত্যি বলতে কি, উজ্জ্বল গাঢ় রঙের শাড়িগুলোতে মাকে অপূর্ব লাগতো। এই যেমন গাঢ় নীল রঙা গরদ শাড়িটি পরলে মাকে একদম ফেয়ারি কুইনের মতো দেখাতো। আমি হা করে তাকিয়ে মাকে দেখতাম। ইদানীং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মা তার গাঢ় সবুজ রঙের জর্জেট, নীল রঙ, গরদ আর বেগুনি, টাঙ্গাইলসহ আরো অনেক শাড়ি পরতে পারেন না।

কারণ এখন আমার মা বিধবা।

খাসিপাড়া, দিনাজপুর থেকে

অপেক্ষা

– আকরাম হোসেন হিমু

তখনকার দিনগুলো ছিল অন্য রকম। মাঝে মধ্যে যখন বিস্মৃত স্মৃতিগুলো রোমন্থন করি তখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। ইচ্ছা হয় আবার ফিরে যেতে ফেলে আসা দিনগুলোয়।

আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো কেটেছে প্রাইমারি লেভেলে। লেখাপড়া বা খেলাধুলায় কখনো প্রথম হতে না পারলেও দুষ্টুমিতে বরাবরই প্রথম হতাম। কিভাবে মেয়েদের চুলে চুয়িংগাম লাগানো যায়, কিভাবে ছেলেদের পাছায় আলপিনের খোচা দেয়া যায় এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা ছিল শীর্ষে! হয়তো বা এ কারণেই বন্ধু–বান্ধব এবং শিক্ষকরা আমাকে 'বি' *দলের সভাপতি* নামে ডাকতো। অর্থাৎ *বানর দলের সভাপতি।* আমার দুষ্টুমির জন্য যে কখনো মার খাইনি তা নয়। প্রতিটা ক্লাসেই ব্ল্যাকবোর্ডে এক নাম্বারে আমার নাম থাকতো।

ক্লাসে এসে ম্যাডাম যখন রাগী স্বরে বলতেন, কি করেছিস? বোর্ডে নাম উঠলো কেন?

তখন দন্ত প্রদর্শনী করে টেনে টেনে অপরাধের বর্ণনা দিতে থাকতাম। এরপর রুটিন মাফিক বেত্রাঘাত হজম করতে থাকতাম। মার খাওয়ার পরও দাত বের করে হাসতাম। আমার হাসি দেখে প্রায় সময় ম্যাডাম আরো রেগে যেতেন। সেই সুবাদে আরো কয়েক গণ্ডা বেতের বাড়ি উপরি হিসেবে পিঠে পড়তো। তবু আমার দুষ্টুমির কমতি হতো না। বীরদর্পে স্কুলে দুষ্টুমি করে বেড়াতাম।

যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একবার নাম দিয়েছিলাম। আমার বিষয় ছিল *যেমন খুশি তেমন সাজো।* অনেক চিন্তা–ভাবনার পর স্থির করলাম নববধূ সাজবো। কিন্তু সেখানেও বাধলো বিপত্তি। কারণ আমাদের ক্লাস ক্যাপটেন রায়হানও নাকি নববধূ সাজবে। কথাটি শোনার পর থেকেই মনে মনে রায়হানের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলাম। শালা একটা মহাহারামি! নববধূ ছাড়া যেন ব্যাটা অন্য কিছু সাজতে পারছে না ইত্যাদি। তাই মনে মনে একটা ফন্দি আটতে লাগলাম। কিভাবে রায়হানকে জব্দ করা যায়। অবশেষে একটা উপায়ও বের করে ফেললাম। এরপর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নির্ধারিত দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আমার কাঙ্ক্ষিত দিনটি চলে এলো। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খেলার প্রথম ইভেন্ট এবং দুপুরের পর দ্বিতীয় ইভেন্ট শুরু হবে বলে জানানো হলো। আমাদেরটা হবে দ্বিতীয় ইভেন্টে। তাই তাড়াহুড়ো না করে সবার সাজ পোশাকগুলো শিক্ষক কমনরুমে নিয়ে রাখলাম। এরপর সবার সঙ্গে প্রথম ইভেন্টের খেলা দেখতে লাগলাম। সহপাঠীরা যখন খেলা দেখায় মগ্ন তখন চুপচাপ শিক্ষক কমনরুমে গিয়ে ঢুকলাম। এরপর ঝটপট পকেট থেকে জর্দার কৌটায় ভর্তি দুই কৌটা বানরের হুল বের করে নিলাম। এরপর নববধূ সাজার জন্য রায়হান যে শাড়িটা এনেছিল সেই শাড়িটায় পুরো দুই কৌটা বানরের হুল ছিটিয়ে যেভাবে ঢুকেছিলাম ঠিক সেভাবে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে খেলা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর মাইকে ঘোষণা করা হলো *যেমন খুশি তেমন সাজো* পর্বের প্রতিযোগীদের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। ঘোষণাটি শোনার পর পরই শিক্ষক কমনরুমে গিয়ে ঢুকলাম সাজার জন্য। সাজার ফাকেই রায়হানের ভাবভঙ্গিও দেখতে লাগলাম। খুব যত্নের সঙ্গে শাড়িটি পরে ফ্যানের নিচে বসে আছে সে। আমিও সেজেগুজে বসে রইলাম মাইকের ডাক শোনার জন্য। এবং মনে মনে রায়হানকে উদ্দেশ্য করে বললাম, বাইরের রোদে বের হও চান্দু তবেই নববধূ সাজার মজা টের পাবে।

গরমের মধ্যে বানরের হুল সবচেয়ে বেশি কার্যকর। তাই নিশ্চিন্ত মনে বসে রইলাম। কারণ চৈত্রের এই কাঠফাটা রোদে মাঠে নামলেই যে রায়হানের নাচানাচি শুরু হয়ে যাবে এতে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। যথারীতি মাইকে আমাদের ডাক পড়লো। এরপর একজন করে মাঠে নামলাম সবাই। কিন্তু প্রায় দশ মিনিটের মতো মাঠে হাটাহাটি করার পরও রায়হানের মাঝে কোনো ভাবান্তর না হওয়ায়

বিস্মিত হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, এই শালা কি মানুষ, নাকি অন্য কিছু? পুরো দুই কৌটা বানরের হুল দেয়ার পরও শালার কিছুই হলো না!

এসব সাত–পাচ যখন ভাবছি ঠিক সেই মুহূর্তে মাঠের অন্য প্রান্তে সোরগোল শুনতে পেলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে শান্ত মেয়েটিকে বড়আপা কোলে করে শিক্ষক কমনরুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং সে পাগলের মতো হাত পা চারদিকে ছুড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই এর কারণটা বুঝে গেলাম। তাই মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। কারণ আমার বোকামির জন্যই মেয়েটার এ অবস্থা। রায়হানের শাড়ি মনে করে তার শাড়ির মধ্যেই বানরের হুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। বেচারি সেই শাড়ি পরে মাঠে নামতেই গরমে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। মেয়েটার এ অবস্থা দেখে হঠাৎ করেই আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। তাই মাঠ থেকে উঠে আসি।

এরপর কমনরুমের সামনে যেতেই বড়আপা আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি একটা রিকশা ডেকে আনো। শিমুকে বাসায় পৌছে দিতে হবে। আমি একটা রিকশা ডেকে দিতেই বড়আপা শিমুকে নিয়ে চলে যান। তার চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে পানি পড়ছিল।

এরপর বেশ কিছুদিন শিমু স্কুলে আসেনি। তাই একদিন তাদের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই হেসে বলে যে, আমায় দেখতে এসেছিস না?

লজ্জা মিশ্রিত স্বরে বললাম, আমি, না।

তবে? পাল্টা প্রশ্ন করে শিমু।

তার কথাটি শেষ হওয়ার আগেই কাদো কাদো স্বরে বললাম, আমাকে ক্ষমা করে দিস শিমু। তোর শাড়িতে আমিই বানরের হুল দিয়েছিলাম। তবে ইচ্ছা করে দিইনি। তোর শাড়িটাকে রায়হানের শাড়ি ভেবেই কাজটা করেছিলাম। আমার কথাটি শোনার পর পরই শিমুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে গেল। কিন্তু আমি দমবার পাত্র নই। তাই বার বার তাকে একই প্রশ্ন করতে লাগলাম, আমাকে ক্ষমা করবি না?

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর হেসে বললো, ঠিক আছে, তোকে ক্ষমা করে দেবো। তবে একটা শর্তে!

কি? বোকার মতো প্রশ্ন করি।

সেই শাড়িটার মতো একটা শাড়ি আমাকে কিনে দিতে হবে। কারণ শাড়িটা আমি দীঘিতে ফেলে দিয়েছি ভয়ে। শাড়িটা আমার খুব শখের ছিল।

কথাটি বলার পর পরই আবিষ্কার করি শিমুর চোখে মরা গাঙের ক্ষীণধারা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বললাম, ঠিক আছে, তোকে সেই রকম একটা শাড়ি কিনে দেবো। তবে তিন মাস পরে। কারণ তখন ঈদ উপলক্ষে অনেক টাকা পাবো। কথাটি বলেই শিমুদের বাসা থেকে বেরিয়ে আসি।

কিন্তু না, শিমুকে দেয়া কথা রাখতে পারিনি। কারণ এর কিছুদিন পরই তারা নোয়াখালী থেকে চলে যায়। তার বাবার ছিল বদলির চাকরি। চলে যাওয়ার দিন খুব কেদেছিল শিমু।

অসহায়ের মতো তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোর শাড়িটা যে দেয়া হলো না?

নিশ্চয়ই আমাদের আবার দেখা হবে। তখন দিস। কাদতে কাদতেই কথাগুলো বলেছিল সে।

এরপর থেকে অপেক্ষায় থাকি, অচেনা কোনো শহরে গেলেই হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে শিমুর মুখাবয়ব খোজার চেষ্টা করি। পাই না। তবুও খুজি। কারণ সে চলে যাওয়ার ছয় ছয়টি বছর পরও

আজো বিশ্বাস করি, আবার আমাদের দেখা হবে। সবুজ ফিতায় বাধা একটি সুদৃশ্য প্যাকেট তার হাতে দিয়ে রহস্য মাখা হাসি দিয়ে বলবো, এই যে শিমু, তোর শখের শাড়ি!

নোয়াখালী থেকে

চঞ্চল

– আল মাহমুদ

মফস্বলের একটি প্রতিষ্ঠানে জীবিকার তাগিদে চলে এসেছি। বেতন উল্লেখ করার মতো নয়। দুই মাস পর হাতে টাকা পাওয়ার পর সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করলাম, একমাত্র প্রিয়তমার জন্য কি কিনবো?
তিনি বললেন, একটা শাড়ি দিয়েই শুরু করুন।
বাড়িতে সকলেরই মন একটু ভার। কেননা সকলের মন রক্ষা করে জিনিসপত্র কিনতে পারিনি। অথচ রাতে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি যখন সবচেয়ে কম মূল্যের উপহারটি পেয়েও সবচেয়ে বেশি খুশিতে কেদে ফেলে তখন আমার চেয়ে সুখী আর কে? লালপেড়ে সবুজ শাড়িতে ফর্শা, চঞ্চল, দুষ্টমতি বৌটাকে সারা দিন চোখের সামনে ভাসতে দেখি।

শেরপুর থেকে

দো- গাছী বস্ত্র বিতান

– পায়েল আহমেদ

আমার মা–বাবা আমাদের তিন ভাই–বোনকে সমান ভালোবাসলেও আমার প্রতি যে একটু কম ছিল তা বুঝতে পারতাম। আমার আপু ছিলেন যথেষ্ট সুন্দরী। তার তুলনায় আমি ছিলাম অতি নগন্য। মা–বাবা যখন আপুকে ভালোবাসতেন তখন আমার খুব কষ্ট লাগতো। ভাইয়া আমার কষ্টকে ভুলিয়ে দিতেন।
আব্বুর চাকরির কারণে আমরা তখন নেত্রকোনায় থাকতাম। ভাইয়া এগৃকালচার ইউনিভর্সিটিতে পড়তেন। পনেরো দিন পর পর ভাইয়া আসতেন এবং আমাকে নিয়ে বেড়াতেন। আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন আপু। আমাদের গ্রামের বাড়িও এই জেলাতে। ভাইয়া যখন আসতো না তখন বাবা–মা আপুকে দেখতে যেতো। এটা চুপ করে শুধু দেখতাম। ভাইয়া বুঝতে পারতো আমার কষ্টটাকে। পড়াশোনার ধাপ পেরিয়ে বাংলাদেশের একমাত্র সন্ত্রাসমুক্ত ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই।
একবার ছুটিতে বাড়ি এলাম। এসে শুনলাম আপুকে দেখতে আসবে। কোনো ডিমান্ড নেই। শুধু সাজিয়ে দিতে হবে মেয়েকে। ছেলেরা খুব বড়লোক। তখন আম্মা বলছিলেন, পায়েলের বিয়েতে অনেক কিছু দেয়া লাগবে। শুনে খুব খারাপ লাগলো আমার।
আপুর বিয়ে হলো। আপুরা বেশ বড়লোক। একবার আপু এসেছেন। আম্মা আর আপুর খুব মিল। দুইজনে কোথায় যাবে বলে বের হচ্ছে। আমার হাতের ধাক্কায় ভাইয়ার চা আপুর শাড়ির ওপর

পড়লো। আমার অবস্থা কি হবে তা তো বুঝতেই পারছি। পরে আম্মাকে বার বার আপু বললেন, আমার দামি শাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল।

আম্মা সবার সামনে এমন কথা বললেন যা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আপু বললেন, তোর মনটা খুব ছোট।

চুপ করে শুনলাম। আসলে আপুর শাড়িটা ছিল অনেক দামি। আমি শনিবারে জন্মেছিলাম।

সবাই বলতো বিশেষ করে মা আর আপু, যে শনি হচ্ছে কুফা। তাই তার কাছে বেশি জিনিস নষ্ট হয়। খুব খারাপ লাগতো কথাগুলো শুনে।

একদিন ভাবীর শাড়ি কিনবো বলে আমি, ভাইয়া-ভাবী গেলাম কুষ্টিয়ার দো-গাছী বস্ত্র বিতানে। ভাইয়ার সহকর্মীর চাচা-চাচির সঙ্গে পরিচিত হলাম। তারপর তাদের একমাত্র ছেলে শিমুলের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য তারা প্রপোজ করেছেন। শিমুল পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমাকে দেখলো এবং আংটি পরিয়ে গেল। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার পর বিয়ে। কোনো ডিমান্ড নেই। এমনকি সাজিয়েও দিতে হবে না।

পরীক্ষা শেষ করে বাড়িতে এলাম। বিয়ের বেশ আয়োজন চলছে। সবাই এলো। আপু এলেন। আপু মাঝে মাঝে এতো ভালো যে, তার মতো ভালো আর কেউ নেই। আমার বিয়ে উপলক্ষে আপু শাড়ি কিনেছেন। পেস্ট কালারের শাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। খুব সুন্দর। নেড়ে দেখতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু দেখলাম না যদি নখে বেধে যায়। সমস্ত আয়োজন শেষে বিয়ে হলো। শ্বশুর-শাশুড়ি আমায় খুব ভালোবাসেন। আমার স্বামী শিমুল তার তো তুলনাই নেই।

আমার বিয়ের এক মাস পর এক ননদের বিয়ে। বিয়ের জন্য আমি খুলনা থেকে এলাম। এসে দেখি আম্মা একটা শাড়ি কিনেছেন। আমার একদিন পর শিমুল এলো। সেও একটা শাড়ি কিনেছে। সবাইকে দেখালেও আমাকে দেখালো রাতে। দেখে আমি অবাক হয়ে থমকে গিয়েছিলাম। কারণ শাড়িটা ছিল আমার বিয়ে উপলক্ষে কেনা আপুর সেই পেস্ট কালারের শাড়ি। শিমুল বার বার বলছিল শাড়ি পছন্দ হয়েছে কি না।

তার কোলে মাথা রেখে বললাম, খুব পছন্দ হয়েছে। আমি কোনোদিন ভাবিনি সেই একই রকম শাড়ি আমার হবে। আমি খুব সুখী। কুষ্টিয়া এলে আমি এবং আম্মা যাই শাড়ি কিনতে। যাই সেই দোগাছী-তে। আমার সেই দোকানে গেলে মনে হয় এখানে এসেই আমার বিয়ে হলো। তাই বার বার আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করি আমার কপালে এতো সুখ ছিল!

কুষ্টিয়া থেকে

তিন অধ্যায়

– জয়নাল

এক.

তখনকার কথা বলছি যখন পাচ সাত টাকা মন ধান ছিল। আমি আযীযুল হক কলেজে পড়তাম। আমাদের সহপাঠিনী হাতে গোনা কয়েকজন ছিল। তাদের দিকে তাকানো আমাদের উচিত না। কারণ

তারা কোনো সিএসপি বা ইপিসিএস অফিসার অথবা কোনো ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার, নিদেনপক্ষে কোনো উকিল সাহেবের গিন্নি হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য কলেজে আসা–যাওয়া করতো। তাদের চোখে আমরা নেহায়েত অকিঞ্চন ছাড়া কিছুই নয়।

তাই বলে আমরা যে আড়চোখে তাদের দিকে একবারও তাকাতাম না তা নয়। তখন *পাছাপেড়ে* শাড়ির চল শহর থেকে তো কবে উঠে গেছে। গ্রাম থেকেও উঠি উঠি করছে। *কলেজপেড়ে* পাবনাই শাড়ি সবেমাত্র বাজারে উঠেছে। আমাদের সতীর্থ মেয়েরা সেই কলেজপেড়ে শাড়ি পরে কলেজে আসতো। উফ! যা চমৎকার লাগতো।

মাস দুই ধরে সকালের নাশতা আর বিকেলের পানি না খেয়ে কোনো রকমে পাচ টাকা জোগাড় করে ছোটবোনের জন্য একটা কলেজপেড়ে শাড়ি কিনলাম। ফিকে কমলা রঙের এক রঙা শাড়ি, এক ইঞ্চি শাদা পাড়।

আমার ছোটবোন সবেমাত্র শাড়ি পরা ধরেছে। শাড়িটা পেয়ে সে কি খুশি! এটা পরে হরিণীর মতো চঞ্চল পায়ে সে পাড়াময় ঘুরে বেড়ালো। বিধবা মায়ের মুখেও আনন্দচ্ছটা দেখা গেল। এ শাড়িটা তার এতোই প্রিয় ছিল যে, আজো মায়ের হাড়া, ডাবর অথবা ঝাপি খুজলে সেই শাড়িটার *তেনা* পাওয়া যেতে পারে।

লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করতে শুরু করলাম। মা–বোনের জন্য শাড়ি কিনে নিয়ে বাড়ি যেতাম। তখন তাদের চোখে মুখে একটা অপার আনন্দের ছাপ দেখতাম। আমারও মন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে যেতো।

দুই.

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হলো বিয়ে করেছি। বিয়ের প্রথম পাচ বছর তার জন্য অনেক আটপৌরে এবং পোশাকি শাড়ি কিনেছি। তবে কখনো তার মন পাইনি। একটা শাড়িও তার পছন্দ হয়নি। কোনোটার পাড় খারাপ, কোনোটার রঙ খারাপ, কোনোটার জমিন খারাপ। তাকে পছন্দ করানোর জন্য একের পর এক শাড়ি কিনেছি। কিন্তু না, কোনোই ফল হয়নি। শেষে তার জন্য শাড়ি কেনা বাদ দিলাম। তার পরনের শাড়ি সেই কেনা ধরলো। আমি শুধু *বাহ! চমৎকার* বলেই খালাস।

তিন.

আজ দুই যুগ হলো সাপের কামড়ে মা মারা গেছেন। বাইশ বছর হলো ধনুষ্টঙ্কার রোগে বোনটাও মারা গেছে। আমার কোনো মেয়ে নেই। আর তার কথা তো আগেই বলেছি। এখন শাড়ি কেনার আনন্দই বলুন আর বিড়ম্বনাই বলুন, কোনোটাই আমার নেই।

রোস্তমপুর, বগুড়া থেকে